ভগবৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

সমসাময়িক বাংলায় সপ্ত যুগন্ধর পুরুষের সহিত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের
ভগবৎপ্রসঙ্গ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা ও দশটী শ্রীরামকৃষ্ণ
সঙ্গীত এবং কালনায় ও বালীতে শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রভৃতি নিবন্ধ সম্বলিত।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সংকলিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশক :—

শ্রীবীরে[illegible]নাথ প্রতিহার বি. এ., বি. টি.

সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

২২নং রমানাথ ভট্টাচার্য্য স্ট্রীট, বেলুড

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া (পশ্চিম বঙ্গ)

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান

১। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

২। মহেশ লাইব্রেরী

২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৩। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স

৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৪। দক্ষিণেশ্বর বুকস্টল, রাণী রাসমণির কালীবাড়ী

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা—৩৫

প্রিন্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল

রাণীশ্রী প্রেস

৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

নিবেদন

বুদ্ধদেব ও সক্রেটিসের কথোপকথনের মত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গ সারগর্ভ, অথচ সুবোধ্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করে বর্তমান ধর্ম-জগৎ পরিতৃপ্ত হয়েছে। কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্তকে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে লিখে ছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনের ভাষা অনবদ্য, অতি সরল ও মর্মস্পর্শী! আমি যখন এই সব পড়ি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই এবং কত আনন্দ অনুভব করি তাহা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।....সক্রেটিসের কথোপকথনে প্লেটোই প্রকটিত হয়েছেন; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গের অন্তরালে আপনি সুগুপ্ত রয়েছেন।"

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমকে ১৯০০ খ্রীঃ ২২শে মার্চ লিখেছিলেন, "আমার অভিমতের যদি কোন মূল্য থাকে তবে স্বামিজীর উদ্ধৃত মন্তব্য আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। গত তিন বর্ষ ব্যাপী অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরের কথামৃত আমার প্রাণরক্ষা করেছে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯০৪ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর লিখেছিলেন, "এই সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ অমূল্য এবং অবতার-বরিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পরিপূর্ণ।" হিন্দি, গুজরাতী আদি ভারতীয় ভাষাসমূহে এবং ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ

প্রভৃতি অনেক বিদেশী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গ অনূদিত হয়েছে। ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যে ইংরাজি গ্রন্থ লিখেছেন তাতে তিনি বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনে যে জীবন্ত ঈশ্বর-ভক্তি এবং ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উন্মত্ততা দেখা যায় তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ।" আলোচ্য কথোপকথনের অনুবাদের ভূমিকায় ইংরাজি মনীষী আলডাশ হাক্সলী লিখেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রাচীন রসিকতা আধুনিক তাত্ত্বিকতার সহিত অদ্ভুত ভাবে সংমিশ্রিত। ইহাতে সারগর্ভ তত্ত্বকথার সঙ্গে পৌরাণিক আখ্যায়িকা সমান স্থান পেয়েছে।" লৌকিকতা বা সামাজিকতা অপেক্ষা পারমার্থিকতার প্রাধান্যই এই সকল ধর্মপ্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মুখে জটিল ধর্মতত্ত্ব কত সরল ও সরস হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সকল মূল্যবান্ ভগবৎপ্রসঙ্গ। এইগুলি শুষ্কতা-বর্জিত ও অমৃতরস-সংযুক্ত।

এই পুস্তকে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাতটী সারগর্ভ ভগবৎপ্রসঙ্গ সংক্ষেপে সংকলিত। ভক্তগণের অনুধ্যানার্থ এই সপ্ত চিত্র চিত্রিত। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ", "শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" প্রভৃতি প্রামাণ্য পুস্তক অবলম্বনে এইগুলি সজ্জিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ—এই সপ্ত যুগন্ধর পুরুষের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রেরণাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ ভগবৎ প্রসঙ্গ হয়েছিল তৎসমুদয় এই গ্রন্থে সংগৃহীত। প্রচ্ছদ-পটে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই সপ্তর্ষি-মণ্ডলে পরিবৃত দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দিষ্ট অধ্যায়ের প্রথমে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে প্রদত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম তিন জনের একবার এবং অবশিষ্ট ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের সহিত একাধিক বার সাক্ষাৎ হয়। অন্তিম শয্যায় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত তাঁর পরিচয় ও ধর্মালাপ হয়। প্রথম চারি জনের সঙ্গে যে ভগবৎপ্রসঙ্গ হয় তৎসমুদয় সমগ্রভাবে এই পুস্তকে সংকলিত। বিজয়কৃষ্ণ, মহেন্দ্রলাল ও গিরীশ ঘোষের সহিত পরমহংসদেবের বহু বার সাক্ষাৎ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ হয়। এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উক্ত তিন জনের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গের সারাংশ প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও অধরলাল সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের যে সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ হয়েছিল তৎসমুদয় মৎপ্রণীত 'নবযুগের মহাপুরুষ' ২য় ভাগে প্রকাশিত।

শ্যামপুকুর ও কাশীপুর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা-ক্ষেত্র। উহার সম্পূর্ণ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এই গ্রন্থে উক্ত অন্ত্যলীলা একটী অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত। উহা পাঠে জানা যায়, ভগবৎপ্রসঙ্গের ভাগীরথী শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরেও পূর্ণ বেগে প্রবাহিতা। ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত দশটী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত প্রথম পরিশিষ্টে প্রদত্ত। এই গানগুলির ভাব ও ভাষা সুমধুর। এইগুলি কোন পুস্তকে বা পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। বালীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের বিবরণ অদ্যাপি অপ্রকাশিত। নাটশালে স্বামী প্রেমানন্দের রামকৃষ্ণ প্রচার এই গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত এবং ইহার প্রাসঙ্গিক অধ্যায়। পরবর্তী পরিশিষ্টদ্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণীর বিশ্বজনীন প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত। অন্তিম পরিশিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। পুস্তকের প্রারম্ভে অনেক মনীষী ও পার্ষদের প্রশস্তি সংগৃহীত।

এই পুস্তকপাঠে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবত জীবন ও অমৃত উপদেশ জানবার কিঞ্চিৎ আগ্রহ পাঠক-পাঠিকার অন্তরে জাগলেই আমার সব শ্রম সার্থক হবে। এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে কতিপয় তরুণ বন্ধুর সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান বার্ধক্যে এই পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশন সম্ভব হত না। অলমিতি—

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া
১৩৬০ সাল, শনিবার
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯ তম জন্মতিথি

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সাতগেছিয়া (কালনা

সূচী

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি

(১)

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা॥
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে।
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে॥
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর দুই হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিকতার ঘনীভূত অভিব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার অদ্ভুত সাধনা বর্তমান ভারতকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

—রোমাঁ রোলাঁ

(৩)

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম-স্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

(৪)

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।

—স্বামী অভেদানন্দ

(৫)

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-চরিত ধর্মসাধনার অপূর্ব ইতিহাস। তাঁহার জীবনালোকে আমরা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হই। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা। রামকৃষ্ণ দেব-ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহার বাণীসমূহ জীবন-বেদের বাক্য, পণ্ডিতের মুখস্থ কথা নয়। সেইগুলি তাঁহার স্বানুভূতিসমূহের বর্ণনা মাত্র। সুতরাং উহারা পাঠকের মনে এমন চাপ রাখিয়া যায়, যাহা সে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম। এই সন্দেহবাদের যুগে রামকৃষ্ণ উজ্জ্বল ও জীবন্ত বিশ্বাসের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে স্বর্গীয় শান্তি দান করিতেছে। অন্যথা এই সকল নরনারী আধ্যাত্মিক আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেন। রামকৃষ্ণের জীবন অহিংসার শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁহার মানবপ্রেম ভৌগোলিক বা অন্য কোন সীমায় আবদ্ধ নয়। যাহারা তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিবেন তাঁহাদের প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরভক্তি প্রেরণা দান করুক।

সবরমতী —এম. কে. গান্ধী

১২ নভেম্বর, ১৯২৪

(৬)

রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিকও নহেন। তথাপি তিনি এই সবই। তিনি শিবোপসনা করেন, কালীপূজা করেন, রামের আরাধনা করেন এবং কৃষ্ণের বন্দনাও করেন। আবার তিনি বেদান্তধর্মের একনিষ্ঠ সাধক ও অসাধারণ আচার্য্য। তিনি প্রত্যেকটী ধর্ম উহার আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার ও প্রথা সমেত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রত্যেকটী ধর্ম সত্য। তিনি সাকার ঈশ্বরের উপাসক এবং নিরাকার ব্রহ্মেরও ধ্যাতা। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানই সমাধি। তাঁহার ঈশ্বর-চিন্তা প্রত্যক্ষানুভূতিপ্রদ সমাধিতে সহজে পর্য্যবসিত হয়।

—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণের মত দ্বিতীয় কোন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।....শঙ্করাচার্য্য হইতে যে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল তাহা সমগ্র দেশ প্লাবনান্তে বাংলায় শ্রীচৈতন্যে, পাঞ্জাবে শিখগুরুগণের মধ্যে, মহারাষ্ট্রে শিবাজীতে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজ ও মাধ্বাচার্য্যে পর্য্যবসিত হইল। ইহাদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়া এক একটী জাতি জাতীয় শক্তি ও ঐক্যের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই সকল ধর্মগুরুগণের বিভিন্ন ভাবধারার অপূর্ব সমন্বয়-মূর্তি। ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, রামকৃষ্ণ-যুগের আন্দোলনে অতীতের সকল খণ্ডিত ও প্রাদেশিক আন্দোলন সমন্বিত হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন সংপূর্ণ ভাবের প্রতিমূর্তি। এত বড় মহাপুরুষের আবির্ভাবে নবযুগ প্রবর্তিত হয়।

—ঋষি অরবিন্দ

(৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আমরা শিক্ষা করি যে, বিশ্ব প্রকৃতিতে ও মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রবল ও ব্যাপক ভাবে ভারতে যেমন উপলব্ধ হইয়াছিল, এমনটী অন্যত্র হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে যে সমুজ্জ্বল ভগবদ্‌ভক্তি এবং ঈশ্বরে সম্পূর্ণ মগ্নতার মর্ম্মস্পর্শী প্রকাশ আছে, তদপেক্ষা প্রবলতর ও স্পষ্টতর প্রকাশ অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার উপদেশ পড়িলে প্রতীত হয়, তাঁহার ভগবদ্ বিশ্বাস কত জীবন্ত ছিল! ভাগবত প্রেম এবং ভাগবত তত্ত্বের উপলব্ধি তাঁহার কত সুগভীর ছিল তাহা তাঁহার উপদেশাবলী পাঠে আমাদের হৃদ্‌গত হয়।

—ফ্রেড্‌রিক মোক্ষমুলার

(৯)

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-মন সর্বদেশের জন্য সমর্পিত ছিল তাঁহার শুভ নামও মানবজাতির সার্বজনীন সম্পত্তি। যে সকল রাষ্ট্র জাতীয় ও দেশীয় গণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া মানবের দেবত্বে বিশ্বাসী তাহারা রামকৃষ্ণের নামে ও ভাবে এক হইতে পারে।

—সিলভঁ্যা লেভি

(১০)

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত খুব কম ব্যক্তিই আধুনিক কালে বাংলা তথা ভারতের চিত্তোপরি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

—লর্ড রোনাল্ডসে

(১১)

রামকৃষ্ণ কে ? তিনি কে তাই জানি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে, এই সোণার বাংলায় এমন সোণার চাঁদ গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে; কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা! তাঁহার ভাগবতী তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল।....রামকৃষ্ণ কে ? রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী।....রামকৃষ্ণ কে ? তিনি সাধকচূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী আবেগময়ী ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন।....ভগবান্ রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল অটল ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সনাতন আর্য্য ধর্মের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদভাবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈত-বিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন বিজয়ী, ব্রহ্মবিজ্ঞানী, ভক্ত-চূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু এবং ভাব-সমন্বয়ের সাগর। নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

(১২)

আমরা এত বেদবেদান্ত পড়িলাম; কিন্তু এই মহাপুরুষের চরিত্রে সকল শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের ন্যায় পণ্ডিতেরা শাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবলমাত্র ঘোলটাই খাইয়া থাকে। বাস্তবিক ইঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরাই মাখনটুকু গ্রহণ করিতে পারেন।

—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

(১৩)

এমন প্রেম, এমন জ্ঞান, এমন রিপুজয় এবং সমদর্শিতা আমি কোথাও কাহারো মধ্যে দেখি নাই। ভগবান স্বহস্তে আমাদের ঠাকুরকে গড়িয়াছিলেন। ভগবানের সমগ্র শক্তি তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়াছিল। আমার ধারণা, জিশু খ্রীষ্ট, চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ একই।

—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(১৪)

গুরুদেব আমাদের প্রত্যেককেই এমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাবিত, তাহাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী স্নেহ করেন। যতই দিন যাইতেছিল ততই আমার গুরুদেবের মহত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করিতেছিলাম। তিনি মানব দেহধারী ভগবান। তাঁহাতেই যাবতীয় দেবদেবী বিদ্যমান।

—স্বামী অদ্ভুতানন্দ

(১৫)

আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামকৃষ্ণদেব মানুষ, না দেবতা, না স্বয়ং ভগবান। তবে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, তিনি একাধারে জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহার ভিতর কোনও প্রকার অহংজ্ঞান ছিল না। যতই দিন যাইতেছে এবং অধ্যাত্ম জগতের প্রকৃষ্ট সন্ধান পাইতেছি, যতই গুরুদেবের চরিত্রের বিশালতা, গভীরতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে যে, ভগবানের সহিত তাঁহার তুলনা করা যায় না ; অর্থাৎ আমরা

সাধারণতঃ যে ভাবে ভগবানকে বুঝিতে চাই সেভাবে তুলনা করিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্তত্বের খর্ব করা হইবে। আমি দেখিয়াছি, তিনি ভগবানের প্রেম সকল নর-নারীকে শিক্ষিত অশিক্ষিত, সৎ অসৎ সকলকেই নির্বিচারে বিলাইতেন। মানবের দুঃখকষ্ট ঘুচাইয়া ঈশ্বর দর্শনের সুযোগ দিয়া তাহাদিগকে শাশ্বত শান্তি প্রদানের জন্য তাঁহার একান্ত উৎকণ্ঠা কি অপূর্ব! মদীয় গুরুদেবের মত বর্তমান যুগে আর কেহই যে মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণকামী ছিলেন না, এই কথা আমি সর্বপ্রযত্নে বলিব।*

—স্বামী শিবানন্দ

(১৬)

গুরুদেবের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়া এবং তাঁহার অতুলনীয় চরিত্র এবং জীবন-কথা সম্বন্ধে ধ্যান করিয়া আমি সবিস্ময়ে ভাবিতেছি যে, তাহাতে মানবত্ব ও দেবত্বের অনুপম সমাবেশ। যদি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না, একই ব্যক্তিতে এমন বিচিত্র এবং বিভিন্ন আদর্শ ও কল্পনার সমাবেশ ঘটিতে পারে। আমার দৃঢ় ধারণা, তিনি মানবরূপে ভগবান। মানব দেহ ও মনের আধারে তাহার ব্যক্তিত্ব ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। বিশ্বের যাঁহারা শিক্ষাগুরু, সেই অত্যল্প সংখ্যক মানবদেহধারী-দিগের মধ্যে তিনিও একজন। ভারতের জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্যই গুরুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বজগণ যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন তিনি তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। জগতের ও ভারতের ধর্ম-বিরোধ সমস্যা গুরুদেবই সমাধান করিয়া

গিয়াছেন। জগতের কল্যাণকল্পে অশ্রুতপূর্ব সাধনার দ্বারা তিনি ভারতের সনাতনী শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

—স্বামী সারদানন্দ

(১৭)

পরমহংসদেবের কাছে যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা সকলেই ধার্মিক ও সাধুস্বভাব ছিলেন। যে সকল ভক্ত যুবক তাঁহারই কাছে গিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার প্রেম কোন সর্তাধীন ছিল না। তাঁহার এই ভালবাসা তাঁহারই পরম দয়ার দ্যোতক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি পাপীর পরিত্রাতা ভগবান রূপেই দেখিয়াছিলাম। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াছিলেন উহার পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত খুব লঘুচিত্ত ছিলেন; কিন্তু আমার মত চপলমতি ও লঘুচেতা লোকের তুলনায় তাঁহারা ঋষিতুল্য। আমি জীবনের সোজা সরল পথে কখনও চলিতে চাহিতাম না; কিন্তু এই সকল ত্রুটী সত্ত্বেও আমি তাঁহার গভীর স্নেহ ও দয়ার পাত্র হইয়াছিলাম। হায়! আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের অন্ত ছিল না। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দেবীর জন্য যে সকল ফল ও মিষ্টান্ন উপহৃত হইত তাহা হইতে তিনি কিছু কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আমার জন্য কলিকাতায় আমার বাড়ীতে লইয়া আসিতেন এবং স্বহস্তে তিনি উহা আমাকে খাওয়াইতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার জন্য যে পায়স হইয়াছিল তাহা হইতে কিছু তিনি স্বহস্তে আমাকে খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি যখন আমার মুখে পায়স তুলিয়া

দিয়াছিলেন, তখন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বয়স্ক পুরুষ। নিজেকে তখন শিশুর মতই মনে হইয়াছিল। আমার তখন এই অনুভূতি হইতেছিল যে, স্বয়ং বিশ্ব-জননী আমাকে খাওয়াইতেছেন। এখন তিনি ইহধামে বিরাজিত নাই; কিন্তু যখনই আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা মনে পড়ে আমার অন্তরতম প্রদেশ ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়ে। পতিত মানবাত্মার প্রতি এমন স্বর্গীয় প্রেম কোনও দেহধারী মানুষের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, ইহা আমি কল্পনা করিতেও পারি না। তাঁহার অন্তিম শয্যাপ্রান্তে আমি কোনও দিন যাই নাই। কারণ সেই দৃশ্য আমার পক্ষে অসহনীয় হইত। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী কত বিচিত্রই ছিল! তিনি আমাকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করেন নাই। আমার গুরুজনগণ আমাকে যে কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন শৈশব কাল হইতেই আমি ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতাম। পরমহংসদেবের শিক্ষাপ্রণালী আমার পক্ষে অব্যর্থ ফল প্রসব করিয়াছিল। যখনই কোন মিথ্যা কথা বলিবার প্রবৃত্তি জাগিত, অথবা কোন পাপ প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ করিত অমনি আমার মানসাকাশে গুরুদেবের দিব্যমুখ ভাসিয়া উঠিত। অমনি আমি সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতাম। শ্রীরামকৃষ্ণ চিরদিনই আমার অন্তরাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তাহা আমার গুণের জন্য নহে, তাঁহারই দয়া ও প্রেম আছে বলিয়া। আমার সমস্ত পাপ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্ম যে কি তাহা বুঝিবার শক্তি আমাকে দিয়াছেন।

—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

(১৮)

এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটীরে। প্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অমানুষিক তপস্যা, সাধন ও সিদ্ধি, মহাশক্তি ও মহাভাবের অরুণোদয় সুরধনী ভাগীরথীর বিমল তটে, বিশাল পঞ্চবটীতে ও নিভৃত বিল্বমূলে। পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উত্তর পার্শ্বে সরকারী বারুদখানার উন্মুক্ত তরবারী করে শিখ প্রহরীগণের ভাগ্যোদয়, লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রভুর বিবিধ সাধন প্রণালী দর্শনে। ঐ শিখ প্রহরীগণের মুখেই প্রভুর প্রথম প্রচার বড়বাজার মাড়োয়ারী মহলে। ক্রমে প্রভুর আকর্ষণে মধুকরের ন্যায় সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরে নর্মদা, ব্রজমণ্ডল, রাজপুতানা ও বঙ্গের বিবিধ মতাবলম্বী সিদ্ধ সাধু, সাধক ও সুধীগণের আগমন। প্রভুর বাল-সুলভ সরল ভাষায় সুগভীর তত্ত্বকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও প্রণত। ভারতেতর দেশেও ভক্ত, সাধক এবং বিভিন্ন ভাবের সমবেত নরনারী প্রভুর চরিত্রে সর্বধর্ম ও সর্বভাব সমন্বয়ের সমাধান দর্শনে সবিস্ময়ে চমকিত। প্রেমাবতার প্রভুর বিশ্বপ্রেম অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। পঞ্চবটীর নিকটে বলীবর্দের পৃষ্ঠাঘাতে "মেলে রে মেলে রে" রবে বালকের ন্যায় প্রভুর রোদন, তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ স্ফীত, রক্তিমাভ আঘাতের চিহ্ন এবং তৃণোপরি গুরুভার কাষ্ঠের আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভূমিতে পতন। ইহাই বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। অলৌকিক ত্যাগের মূর্ত বিকাশ, ধাতু-স্পর্শে প্রভুর হস্ত আড়ষ্ট, কুতূহলী ভক্তগণের পরীক্ষায় ইহা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন নরনারীর অবিরত আগমনে প্রভুর "কে কোথায় আছিস্ আমার কাছে আয় আয়" আহ্বানে সাড়া এবং ঐ আহ্বানের প্রভাবে কেমন সুদূর প্রসারী তাহার অবশ্যম্ভাবিতা সহজেই অনুমেয়। প্রভুর ভূভারহারী নামের সার্থকতা এবার ষোল কলায় পূর্ণ। এরূপ আর কোন যুগে হয়

নাই। মূর্তিমান বিশ্বপ্রেম, ভাবসমাধিমগ্ন নগ্ন প্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যবধানে বিগত মহাযুদ্ধের সংঘটন। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ দেশ, কাল ও আধার বিবেচনায় তাহার অপূর্ব বিধান। প্রভুর 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' বাক্যের অদ্ভুত সমাধান। বঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অপনয়ন এবং ত্যাগের ভাবের অনুপ্রাণন এবং জাগরণ। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্বোধন ও দ্রুততর উন্নয়ন। ইহা অচিন্ত্য। প্রভুর বিধানে বঙ্গের আউস, আমন ও বোরো ধান্যের ক্ষেত্রে পেশোয়ারী আউস ধান উপ্ত হয় নাই। সুদূর ভারতেতর দেশে উপ্ত বীজ হইতে ফলোদ্‌গম আজ প্রত্যক্ষ। ইহা কেহ বোঝে না ও জানে না যে, কোথায় কী ভাবে এই নবযুগের অরুণালোকে জগৎ উদ্‌ভাসিত। অপূর্ব মহিমার দীপ্তালোকে আলোকিত হইবার শুভ দিন সম্মুখে। প্রভুর সর্বধর্ম-সমন্বয় এবং কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানব জাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সারে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতেছে। যখন জগতে এক এক সার্বভৌমিক শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর আহ্বানে সকল প্রকার বাদ-বিসম্বাদ-বর্জিত, উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ' বাণীর জয় ঘোষণায় তৎপর এবং নবযুগের পতাকামূলে সমবেত, তখনই প্রভুর আগমনে মাধ্যন্দিন প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে।

—স্বামী অখণ্ডানন্দ

(১৯)

নরদেব শ্রীরামকৃষ্ণের আকৃতি মধ্যবিধ, তবে বাহুদ্বয় যেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। করতলদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন, যেন কোন অদৃশ্য দেবতার উপাসনারত। বক্ষঃস্থল বিশাল ও আরক্তিম, বর্ণ গৌর, হরিদ্রা ও অলক্ত-মিশ্রিত; তবে রৌদ্র তাপে তাপিতের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ, ঠোঁটদুটী লাল টুকটুকে। কপালে যে সিন্দূর-টিপটী উহারই সমবর্ণ। চক্ষুদ্বয় টানা হইলেও হরিকথা শুনিতে শুনিতে শিবনেত্র। চমক ভাঙ্গিবার জন্য মধ্যে মধ্যে 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলিয়া নেত্র মার্জন করিতেছেন। মধ্যবিৎ ভাবে কেশও শ্মশ্রুবিশিষ্ট হইলেও পারিপাট্যবিহীন; পরিধানে লাল পেড়ে ধুতি কোঁচা না করিয়া এলোথেলো ভাবে স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত। উদরে প্লীহা চিকিৎসার দাগ যেন কবচের মতন অঙ্গশোভার উৎকর্ষ করিয়াছে। দেহের গঠন এককালে দৃঢ় হইলেও কঠোর তপস্যায় এখন যেন শিথিল ও কোমল; চন্দ্রালোকে গৃহাভ্যন্তর যেমন মৃদু উজ্জ্বল হয়, রূপ-জ্যোতিতে ঘরটী সেইমত হইয়াছে। মুখকমল প্রসন্ন ও প্রীত। একাসনে বসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে সকলকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি মিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। ফুলের তোড়া বা ধূপ জ্বালান না থাকিলেও অনুভব করিলাম, অঙ্গ-সৌরভে ঘরটী সুবাসিত, অনেকটা পদ্ম-গন্ধের মত। দেখিবামাত্র যেন কতকালের আপনার বলিয়া প্রেরণায় মাথাটী আপনা হইতেই তাঁহার শ্রীপদে লুটিয়ে পড়িল।

—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

(২০)

ভগবান গীতায় জ্ঞানীর জন্য মুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব জন-সমাজের স্তরে স্তরে নির্বাণ দান করিয়াছিলেন। এই কলিযুগে ভগবান রামকৃষ্ণ আর্য্যাবর্তের আর্ষ জ্ঞান, বেদও উপনিষৎ, ব্রহ্ম-বিদ্যার সার, সর্বধর্মের সারসত্য মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-মুখপদ্ম হইতে বিগলিত এই উপদেশ রূপ অমৃত ফলে পাপী, তাপী, ভোগী ও যোগীর সমান অধিকার। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐহিক ও পারমার্থিক শান্তির সেতু। দয়াল ঠাকুর পতিত জাতির উদ্ধারকর্তা। তিনি ভারতের তপোবনে যে বীজ বপন করিয়াছেন তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে। কালে সেই কল্যাণ-কল্পতরু বিশাল বনস্পতির আকার ধারণ করিবে। ইহা মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া জগজ্জনের উপজীব্য হইবে। সেই বিরাট বনস্পতির পবিত্র ছায়ায় সমবেত হইয়া জগদ্বাসী বিশাল মানবতা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কথামৃত

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৩১।৯) আছে, গোপিকাগণ রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ-বিরহে সন্তপ্ত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ভগবন্, তোমার কথামৃত তাপিত জনের জীবনপ্রদ, কবিগণ কর্তৃক সংস্তুত, পাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল-সাধক ও স্নিগ্ধকর। যাঁহারা তোমার কথামৃত সবিস্তারে বলেন বা শুনেন বা পড়েন তাঁহারা অতিশয় পুণ্যবান।

"তব কথামৃত তপ্ত এ জীবনে।
শান্ত করিবে জ্বালা ভয় কিবা মরণে॥
কবিজন স্তুতি গায় অমিয় এ বাণী।
শুনে হয় মঙ্গল জুড়ায় পরাণী॥
মুছে যায় কলুষ যা ভরা আছে মনে।
কল্মষহারী নাম পশিলে শ্রবণে।"

—ভক্ত-কবি প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভগবৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

এক

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পরেই তাঁর স্থান ছিল ব্রাহ্ম সমাজে। তাঁর সুগভীর ধর্মানুরাগের জন্য ব্রাহ্মগণ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধি দান করেন। ইনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ব্রাহ্ম ধর্ম', 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ। তিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত বৃত্তি ও বাংলা ব্যাখ্যা রচনা করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে যেতেন এবং ধর্ম-চর্চা করতেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ কবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তা নির্ণয় করা সুকঠিন। রাণী রাসমণির জামাতা এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট নিয়ে যান। মথুরানাথ ১৮৭১ খ্রীঃ জুলাই মাসে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং উল্লিখিত মহাপুরুষদ্বয়ের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই উক্ত তারিখের পূর্বেই ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় যথাক্রমে ১৮৩৬ এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রধান রসদ্দার ও প্রথম শিষ্য মথুরানাথকে বললেন, "আমি শুনেছি, দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, তাকে আমার দেখবার ইচ্ছা হয়।" মথুরানাথ প্রথমাবধি শ্রীরামকৃষ্ণকে শিষ্যবৎ ভক্তি ও পুত্রবৎ সেবা করতেন এবং 'বাবা' বলে

ডাকতেন। তিনি উত্তর দিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় দেবেন্দ্রের কাছে নিয়ে যাব। আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তুম। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে।" সেজন্য পূর্ব থেকে কোনরূপ বন্দোবস্ত না করেই তিনি পরমহংসকে নিয়ে একদিন মহর্ষির নিকট উপনীত হলেন। দুই সহপাঠীর মধ্যে বহু দিন পরে সাক্ষাৎ হল। দেবেন্দ্রনাথ রহস্য করে মথুরানাথকে বল্‌লেন, "তোমার শরীর একটু বদ্‌লেছে, তোমার ভুঁড়ি হয়েছে!"

মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথকে বল্‌লেন, "ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন। ইনি 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করে পাগল।" অধ্যাত্ম লক্ষণ দেখবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে বল্‌লেন, "দেখি গো, তোমার গা।" দেবেন্দ্রনাথ যখন নিজ দেহের জামা খুল্‌লেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, "তাঁর গাত্র গৌর বর্ণ, তদুপরি যেন সিঁদুর-ছড়ান রঙ, মাথার চুল পাকে নি।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য্য এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও মান-সম্ভ্রমের অধিকারী এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম যুগন্ধর পুরুষ। সেজন্য তাঁর অভিমান দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথকে বল্‌লেন, "আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী' বলে অভিমান থাকতে পারে?" দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অবস্থা হল, যাতে কে কিরূপ লোক তিনি দেখতে পেতেন এবং পণ্ডিত ফণ্ডিতকে তৃণজ্ঞান করতেন। যদি তিনি দেখতেন, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই, তাঁকে খড়-কুটোর মত বোধ হত। শকুনি যেমন উঁচুতে

উঠলেও ভাগাড়ের দিকে নজর রাখে তেমনি সে পণ্ডিত তত্ত্বকথা মুখে বললেও তার মন বিষয়াসক্ত থাকে।

সে অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, মহর্ষির যোগ ও ভোগ দুইই আছে। তাঁর অনেকগুলি ছেলেপিলে ছিল এবং তখন ডাক্তার এসেছিলেন চিকিৎসা করতে। অত বড় জ্ঞানী হয়েও তাঁকে সংসার নিয়ে থাকতে হত। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, "তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।" তখন দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদ থেকে কিছু তত্ত্বকথা শুনালেন এবং বললেন, "এই জগৎ যেন ঝাড়-আলোর মত, আর জীব হয়েছে ঝাড়-আলোর এক একটা দীপ।" শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পঞ্চবটীতে ধ্যান করতেন তখন এই বেদ-তত্ত্ব তাঁর উপলব্ধি হয়। দেবেন্দ্রনাথের কথার সহিত স্বীয় অনুভূতির ঐক্য দেখে তিনি অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং ভাবলেন, "তবে তো এ খুব বড় লোক।" তিনি মহর্ষিকে উক্ত বেদতত্ত্ব আরও ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানালেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ বললেন, "এই জগৎ কেন হয়েছে জানতো? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার হয়, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।"

এরূপে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথাবার্তা হল। এতে দেবেন্দ্রনাথ খুসী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "তোমাকে আমাদের উৎসবে আসতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার তো এই অবস্থা দেখছ। কখন কি ভাবে তিনি রাখেন ঠিক নাই।

দেবেন্দ্রনাথ—না, আসতে হবে। তবে ধুতি পরে আর উড়ানি গায়ে দিয়ে এস। তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না। ইহা শুনে দেবেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ প্রভৃতি সকলে হাসতে লাগলেন। পরদিনই মথুরানাথের নিকট দেবেন্দ্রনাথের চিঠি এল। তাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্মোৎসবে যেতে নিষেধ করেছিলেন; এবং লিখেছিলেন, "অসভ্যতা হবে, যদি গায়ে উড়ানি না থাকে।"

পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা স্বীয় ভক্তদিগকে একাধিক বার বলেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অধরলাল সেন, নিত্য-নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে বসে আছেন, এমন সময় অধরলাল দেবেন্দ্র ঠাকুরের ত্যাগের প্রশংসা করলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কি বল! ও যা ভোগ করেছে এমন কে করেছে! যখন সেজবাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম তার ছোট ছোট ছেলে অনেকগুলি। ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার কয়েকটী মেয়ে সে ঈশ্বরচিন্তা করবে না তো কে করবে? এত ঐশ্বর্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বর-চিন্তা না করত লোকে বলত, ধিক্।"

তখন নিত্যনিরঞ্জন সেন বললেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঋণ উনিই সব শোধ করেছিলেন।" ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে উত্তর

দিলেন, "রেখে দে ওসব কথা, আর জ্বালাসনে! ক্ষমতা থাকতেও যে বাপের ঋণ শোধ করে না সে কি আর মানুষ? তবে সংসারীরা একেবারে সংসারে ডুবে থাকে। তাদের তুলনায় দেবেন্দ্র খুব ভাল। তাকে দেখে সংসারীদের শিক্ষা হবে।"

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শারদীয়া অবকাশে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বসে আছেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবৎপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রকে বললেন, "কেশব, একদিন তোমার ওখানে গিছ্‌লাম। শুনলাম, তুমি বলছ, আমরা ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ-সাগরে পড়বো।....তোমরা গৃহী। একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি করে গিয়ে পড়বে? সেই নেউলের মত পেছনে বাঁধা ইট। কোন কিছু হলে নেউল কুলঙ্গায় উঠে বসলো; কিন্তু সেখানে থাকবে কেমন করে? ইটের টানে আবার দুপ্‌ করে নেমে পড়ে। তোমরা একটু ধ্যান ট্যান করতে পার; কিন্তু ঐ দারাসুতরূপ ইট আবার তোমাদিগকে টেনে নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি-নদীতে ডুব দেবে, আবার উঠবে। তোমবা একেবারে ডুবে যাবে কি করে?"

কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "গৃহীর কি পরা ভক্তি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?" শ্রীরামকৃষ্ণ 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র' দুই তিন বার বলে তাঁর উদ্দেশ্যে কয়বার প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, "তা জান, এক জনের বাড়াতে দুর্গোৎসব হত। তখন উদয়াস্ত পাঁঠাবলি চল্‌তো। কয়েক বৎসর পরে বলিদানের ধূমধাম বন্ধ হয়ে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, "মশায়, আজকাল দুর্গোৎসবে আপনার বাড়ীতে ধূমধাম হয় না কেন?" সে বল্‌লে,

"আরে এখন দাঁত পড়ে গেছে!" দেবেন্দ্র ঠাকুর এখন ধ্যান ধারণা করছে। তা করবেই ত! তা কিন্তু সে খুব মানুষ।"

দুই

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার সাহিত্যসম্রাট ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নৈহাটীর নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। 'আনন্দ মঠ', 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি চব্বিশখানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। তাঁর 'আনন্দমঠ' রুশদেশীয় মনীষী ম্যাক্সিম গর্কির 'মা' এবং বাংলার অমর ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র মত অপূর্ব উপন্যাস এবং স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপক। তিনি প্রসিদ্ধ মাসিক 'বঙ্গদর্শনে'র সংস্থাপক ও সম্পাদক ছিলেন। নৈহাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ এবং কলিকাতায় বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট হয়েছে তাঁর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে। ১৯০৩ খ্রীঃ (১৩০৯ সালে) তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি বাংলার অন্যতম অমর মনীষী। অসাধারণ তেজস্বী, মেধাবী ও পিতৃভক্ত ছিলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয় ২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর) শনিবার কলিকাতায় শোভাবাজারে বেনেটোলায় শ্রীঅধরলাল সেনের বাটীতে। অধরলাল ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রও ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট এবং অধরলালের বন্ধু ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো অধরলালের বাটীতে যেতেন এবং ভক্ত সঙ্গে মিলিত হতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত দিন অধরলালের বাড়ীতে গিয়ে উপবেশনান্তে সহাস্য বদনে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় অধরলাল কয়েকটী বন্ধু নিয়ে তাঁর কাছে এসে বসলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "মহাশয়, ইনি খুব এঁর নাম পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিমচন্দ্র (হাসতে হাসতে)—আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে তিনি ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কৃষ্ণ কাল কেন জান? আর চোদ্দ পোয়া, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে থাকেন ততক্ষণ কাল দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে কাল দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে জল আর কাল দেখায় না। তখন খুব পরিষ্কার সাদা দেখায়। কালী কাল কেন? একটি কালী-সঙ্গীতে আছে, 'উজল ঝলকে আলো কাল বরণ ঘটায়।' সূর্য্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর কাল বা ছোট মনে হয় না। সে অনেক দূরের কথা। সমাধিস্থ না হলে সেরূপ দর্শন হয় না। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে ততক্ষণ নামরূপও থাকে। তাঁরই সব লীলা। 'আমি' 'তুমি' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি নানা রূপে প্রকাশিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আগ্ঠা শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ; তাঁদের ভেদ নাই। প্রকৃতি না হলে পুরুষ থাকতে পারে না। প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাকতে পারে না। একটী বল্‌লেই আর একটী তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগল মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌরবর্ণ বিদ্যুতের মত। শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন, আর নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায় নূপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যুগল মূর্তি-রহস্য শুনে বঙ্কিম, অধর ও মাষ্টারাদি ভক্তগণ অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং এই বিষয়ে পরস্পর ইংরাজিতে অনুচ্চ স্বরে কথা কইতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি)—কিগো, তোমরা ইংরাজিতে কি কথাবার্তা কইছ?

ইহা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাতে যোগ দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে সকলের প্রতি)—একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন, একটা গল্প বলি। একটী নাপিত একজনকে কামাতে গিয়েছিল। সে ভদ্রলোকটীকে কামাতে আরম্ভ করল। এখন কামাতে কামাতে ক্ষুরটা তার একটু

লেগেছিল। আর সে লোকটী ড্যাম (dam) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানত না। তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে শীতকালে জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে 'তুমি আমায় ড্যাম বললে! এর মানে কি, এখন বল।' সে লোকটী মুস্কিলে পড়ে বললে, 'আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়। তবে একটু সাবধানে কামাস্।' নাপিত ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলতে লাগল, 'ড্যাম মানে যদি ভাল হয় তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয় তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম তোমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম! আর শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম, ডাড্যাম ডাড্যাম ড্যাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে হাস্যোদ্দীপক গল্প শুনে সমবেত ভক্তগণ উচ্চ হাস্য করলেন। সকলের হাস্য বন্ধ হলে বঙ্কিমচন্দ্র আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

বঙ্কিম—মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাসতে)—প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা! তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি, তুমি বকে যাচ্ছ। ঐ দুদিন লোকে শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুগ আর কি? তবে যতক্ষণ তুমি বলবে, ততক্ষণ লোকে কইবে, আহা! ইনি বেশ বলছেন। তুমি থামবে, আর কোথাও কিছু নাই!

যখন দুধের নীচে আগুণের জ্বাল রয়েছে তখন দুধটা ফোস্ করে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন ছিল তেমনি কমে গেল। আর সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়; তা না হলে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার জায়গা নাই আবার ডাকে, 'ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে শুবি আয়।' (হাস্য)। ওদেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্য করে যেত। লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। লোক গালাগালি দেয়, তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত করে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা নোটিশ মেরে দিলে, "এখানে বাহ্য প্রস্রাব করিও না। তা করলে শাস্তি পাবে।" তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোন গোলযোগ নাই। কোম্পানির হুকুম সকলকে মানতে হবে। তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন তবেই প্রচার হয়, লোক-শিক্ষা হয়। তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বঙ্কিমাদি ভক্তগণ গম্ভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববৎ বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে ভগবৎপ্রসঙ্গ বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত। আর কত বই লিখেছ। আপনি কি বল? মানুষের কর্তব্য কি? মৃত্যুর পর কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র—পরকাল! সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বর লাভ না হয়

ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়; কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞানলাভ হলে, ঈশ্বর দর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায়। আর সংসারে আসতে হয় না। সিধোনো (সিদ্ধ) ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে যদি কেউ সিদ্ধ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সিদ্ধ পুরুষ সংসার করতে পারে না। তার তো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো ধান আর ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে? তাতে অঙ্কুর হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র (হাসতে হাসতে)—মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে সে অমৃত ফল লাভ করেছে। সে ফল লাউ কুমড়ো নয়। তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্য্যলোক বল, চন্দ্রলোক বল, কোন লোকে তাকে আসতে হয় না। উপমা একদেশী। তুমি ত পণ্ডিত। ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বললে যে, বাঘের মত একটা ভয়ানক ন্যাজ, কি হাঁড়ি-মুখ থাকবে তা নয়। (সকলের হাস্য)।

আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে, 'মহাশয়, পরকাল কি আছে?' আমি না এদিক না ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকোতে দেয়। তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গরু টরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে। এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে

দিয়ে নূতন হাঁড়ি করে ; ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে ; ছাড়বে না। অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই।

তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে। কেন না, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কাজ আর হয় না। জ্ঞানী মায়ার পারে চলে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কী করবে? তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন মায়ার সংসারে লোক-শিক্ষার জন্য। জ্ঞানী বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে থাকে। তাঁর কাজের জন্য সেটী তিনিই রেখে দেন—যেমন শুকদেব, শংকরাচার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিম হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, তা যদি বলেন তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হয়ে)—এঃ। তুমি ত বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া! তুমি যা রাতদিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর উঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভেতর রাতদিন রয়েছ, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয়-চিন্তা করলে পাটোয়ারী স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর-চিন্তা করলে মানুষ সরল হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ওকথা কেউ বলবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বঙ্কিমের প্রতি)—শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে, যদি ঈশ্বর-চিন্তা না থাকে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্যে কি হবে, যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে? চিল, শকুনি খুব

উঁচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে তাদের কেবল নজর! পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়তে পারে। কেউ বই লিখেছে; কিন্তু মেয়ে মানুষে আসক্ত, টাকা মান সার বস্তু মনে করেছে। সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি?

কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ঈশ্বর, ঈশ্বর করছে, এরা পাগলা! এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন সেয়ানা! কেমন সুখভোগ করছি—টাকা, মান, ইন্দ্রিয়-সুখ! কাকও মনে করে, আমি বড় সেয়ানা। কিন্তু সকাল বেলা উঠেই সে পরের গু খেয়ে মরে! কাক দেখ না, কত উড়ুর উড়ুর করে। ভারী স্যায়না। (সকলেই স্তব্ধ)। কিন্তু যারা ঈশ্বর চিন্তা করে তারা বিষয়াসক্তি, কামিনী-কঞ্চনে ভালবাসা ত্যাগ করবার জন্য রাত্তদিন প্রার্থনা করে। যাদের বিষয়-রস তেতো লাগে, তাদের হরি-পাদ-পদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না। তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধে-জলে মিশিয়ে দাও জল ত্যাগ করে সে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছ, এক দিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না, তার আর কিছু ভাল লাগে না। (বঙ্কিমের প্রতি কোমল ভাবে) আপনি কিছু মনে করো না।

বঙ্কিমচন্দ্র—আজ্ঞে, মিষ্টি কথা শুনতে আসিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। মায়া ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। দুই একটী ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগিনীর মত থাকতে, আর তার সঙ্গে সর্বদা

ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনের মন তাঁর দিকে যাবে; আর স্ত্রীও ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে পশুভাব চ'লে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা চাই। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন, যদি আন্তরিক হয়।

আর চাই কাঞ্চন ত্যাগ। আমি পঞ্চবটী তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটী', 'মাটী টাকা', 'মাটিই টাকা', 'টাকাই মাটি', বলে দুটী জলে ফেলে দিছলুম।

বঙ্কিমচন্দ্র—টাকা মাটি! মহাশয়, চারটা পয়সা থাকলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটিই হয় তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে, তুমি পরোপকার কর! মানুষের এত নপর-চপর; কিন্তু যখন ঘুমোয় তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তা টের পায় না, মুতে মুখ ভেসে যায়। তখন অহংকার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়। সে আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আর খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কাউকে কিছু দেয় সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া করবে? দান-টান সবই রামের ইচ্ছা। খাঁটি সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাইরেও ত্যাগ করে। সে গুড় খায় না, আর কাছে গুড় রাখেও না। কাছে গুড় রেখে যদি সে বলে, 'গুড় খেও না' তাহলে লোকে তার কথা শুনবে না।

সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে; কেন না তার মাগ-ছেলে

আছে। তাদের সঞ্চয় করতে হয়, মাগ ছেলেদের খাওয়াবার জন্য। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ; অর্থাৎ পাখী আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখীর ছানা হলে সে মুখে করে খাবার আনে। তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার পরিবার ভরণ-পোষণ করবার জন্য। গৃহী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। আসল ভক্ত কর্মের ফল—লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাত দিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না। এর নাম নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম। সন্ন্যাসীর সব কর্ম নিষ্কাম হওয়া চাই। তবে সন্ন্যাসী সংসারীর মত বিষয়-কর্ম করে না।

সংসারী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, পরোপকারের জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই কল্যাণ হয়, পরোপকার নয়। সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের মধ্যে নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা। যদি কেউ এরূপ করে আর সে মান, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গও চায় না, প্রত্যুপকারের আশাও রাখে না, তাহলে যথার্থ নিষ্কাম কর্ম হয়, অনাসক্ত কর্ম হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্মে আত্ম-কল্যাণই হয়। এর নাম কর্মযোগ। গীতায় এই কর্মযোগের কথা আছে। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু এই যোগ বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে উপযোগী নয়।

তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে, দয়া-দান করে সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল এক ঈশ্বর করেছেন—যিনি চন্দ্র-সূর্য, বাপ-মা, ফল-ফুল-শস্যাদি জীবের জন্য

করেন। বাপের মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ, জীবরক্ষার জন্য তিনিই দিয়েছেন। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া, অসহায় মানুষের রক্ষার জন্য তিনিই দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না। জীবের কর্তব্য কি? তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকে যাতে লাভ হয়, তাঁর দর্শন হয় সেজন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই জীবের কর্তব্য।

শম্ভু মল্লিক বলেছিল, "আমার ইচ্ছা হয়, কতকগুলো ডিস্‌পেন্সারী হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বল্‌লুম, "হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এসব কর তা মন্দ নয়।' তবে ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে জানতে দেয় না। মনে হচ্ছে, নিষ্কাম ভাবে করছি; কিন্তু হয়ত যশের ইচ্ছা, সুনামের আকাঙ্ক্ষা মনে সুপ্ত আছে। আর বেশী কর্ম করতে গেলে কর্মের ভিড়ে লোকে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। শম্ভুকে আরও বল্‌লুম, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন তাহলে তুমি তাঁকে চাইবে, না কতকগুলো ডিস্‌পেন্সারী ও হাসপাতাল চাইবে?' তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরীর পানা খেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।

যারা হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারী করবে আর তাতেই আনন্দ পাবে তারাও ভাল লোক; কিন্তু তাদের থাক আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। বেশী কাজের মধ্যে যদি সে পড়ে

ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, "হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও। তা না হলে নিশিদিন যে মন তোমাতে লেগে থাকবে সে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে; সে মনে বিষয়-চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তের থাক আলাদা। ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু। এই বোধ পাকা না হলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুই দিনের জন্য। আর যিনি এ সংসারের কর্তা তিনিই সত্য, নিত্য—এই বোধ দৃঢ় না হলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। জনকাদি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে নিষ্কাম কর্ম করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা ভাবে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স, না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিমচন্দ্র—হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে? তাই আগে পড়াশুনা করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ তোমাদের এক কথা! আগে ঈশ্বরকে জান, তারপর তাঁর সৃষ্টিকে বুঝবে। তাঁকে লাভ করলে দরকার হলে সবই জানতে পারবে। যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পার যো সো করে, তাহলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক'খানা বাগান—এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই সব বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়, তাহলে ক'খানা বাড়ী, কত কোম্পানীর

কাগজ, কখানা বাগান এসব খবর কি করে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়। বেদে আছে, 'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' তিনি জ্ঞাত হলে এই সমস্ত জ্ঞাত হয়। কিন্তু তাঁকে জানার পর সামান্য বিষয় জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায় ততক্ষণ তার গুণের কথা বলা যায়। সে যেই সামনে আসে তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর হয়। তখন তার গুণগান আর চলে না।

আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর জগতের জ্ঞান। বাল্মীকিকে রামমন্ত্র জপ করতে দেওয়া হল। কিন্তু তাকে বলা হল, মরা মরা জপ কর। 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ। একেকে জানলে সব জানা যায়। একের পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। একেকে পুঁছে ফেললে শূন্যের দাম কিছু থাকে না। একেকে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর, তারপর জীবজগৎ। জীশু খ্রীষ্ট বলতেন, 'প্রথমে স্বর্গরাজ্যের সন্ধান কর। তা হলে অন্য সব বস্তু তোমার লাভ হবে।'

তোমার দরকার ঈশ্বরকে জানা। তুমি অত জগৎসৃষ্টি, সায়েন্স ফায়েন্স করছ কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এসব খবরে তোমার কাজ কি? তুমি আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। এ সংসারে মানুষ এসেছে ভগবান লাভের জন্য। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র—আম পাই কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। প্রার্থনা আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়ত এমন কোন সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে খুব সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়ত বলে দেয়, এমনি এমনি কর, তা হলে ঈশ্বকে পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র—কে ? গুরু ! তিনি নিজে ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম খেতে দেন। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলে কি পোলোয়া কালিয়া খেলে হজম করতে পারে ? বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পোলোয়া কালিয়া দেয় না। যে দুর্বল, যে পেট-রোগা তাকে মাছের ঝোল দেয়। তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসে ?

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা শিশুর মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বর লাভ হয়। শিশুর কি সরল বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়,' অমনি শিশু বিশ্বাস করল, 'ও আমার দাদা।' শিশুর পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। শিশু হয়ত বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়ত ছুতোর বা কামারের ছেলে। শিশু বিনা বিচারে বিশ্বাস করে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে। শিশুর পাকা বিশ্বাস হল, ও ঘরে জুজু। শিশুর মত গুরু বাক্যে বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরলতা থাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। কপট হলে ঈশ্বলাভ হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ, কপট থেকে তিনি অনেক দূরে। কিন্তু শিশু মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না। শিশু

কিছুতেই ভোলে না. আর বলে, 'না, আমি মার কাছে যাব।' সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! সে কি অবস্থা! সংসারে যার বিষয়-সুখ, বিষয়-ভোগ আলুনি লাগে; টাকা মান, দেহ-সুখ, ইন্দ্রিয়-সুখ যার ভাল লাগে না সেই আন্তরিক ভাবে 'মা' 'মা' করে ডাকতে পারে। তারই জন্য মা সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসে।

এইরূপ ব্যাকুলতা চাই। যে পথেই যাও—হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও ঐরূপ ব্যাকুলতা সার কথা। তিনি তো অন্তর্যামী। ভুল পথে গেলেও ভয় নাই, যদি ব্যাকুলতা থাকে। তখন তিনি ভাল পথে টেনে নেন। আর সব পথেই ভুল-ভ্রান্তি আছে। সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে; কিন্তু কারুর ঘড়ি ঠিক চলে না। তা বলে কারুর কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়। সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে নেওয়া যায়।

ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল গান করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনতে শুনতে ভাবাবেশে হঠাৎ দণ্ডায়মান হলেন। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় একেবারে সমাধিস্থ, বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাধিস্থ অবস্থা ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি। তিনি ব্যস্তভাবে ভীড় ঠেলে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন এবং নিষ্পলক নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য জ্ঞান এল। ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যবৎ নৃত্য করতে লাগলেন। সে কি অদ্ভুত নৃত্য! সে কি দিব্য দৃশ্য! বঙ্কিমাদি ইংরাজি-পড়া ভদ্রলোকগণ ঠাকুরের নৃত্য দেখে বিস্মিত হলেন।

কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করছিলেন তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখালেন। নৃত্য শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ভগবানকে প্রণাম করলেন এবং বললেন, "ভগবৎভক্ত, ভগবান, জ্ঞানী, যোগী, প্রেমিক সকলের চরণে প্রণাম।" ঠাকুর আসন গ্রহণ করলে বঙ্কিমাদি ভক্তবৃন্দ তাঁর চার দিকে উপবেশন করলেন। পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গ চল্‌ল।

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতা চাই। ছেলে মেয়ে যেমন মাকে না দেখতে পেয়ে মার জন্য কাঁদে সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অরুণোদয় হলে পূর্ব দিক লাল হয়। তখন বোঝা যায়, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেরূপ যদি ঈশ্বরের জন্য কারো প্রাণ ব্যাকুল হয় তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই ব্যক্তির ঈশ্বরলাভে আর দেরী নাই।

একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মহাশয়, বলে দিন, ঈশ্বরকে কেমন করে পাব।" গুরু বল্‌লেন, এসো আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামল। এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে নিয়ে জলে চুবিয়ে ধরল। খানিক পরে ছেড়ে দিতে শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়াল। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, "জলের মধ্যে কি রকম বোধ হচ্ছিল।" শিষ্য বল্লে, প্রাণ যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু পাটু কচ্ছিল। তখন গুরু বল্‌লেন, ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ঐরূপ ছটফট্ করবে তখন জানবে, তাঁর দর্শনের আর দেরী নাই। তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? জলে একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে,

জলের উপর হাত পা ছুঁড়লে কি হবে। আসল মাণিক বেশ ভারী হয়, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। আসল মাণিক পেতে হলে জলের নীচে ডুব দিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাশয়, কি করি? পেছনে শোলা বাঁধা আছে, ডুবতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামে কাল-পাশ কাটে। ডুব দিতে হবে তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। কবীরের একটা গান শোন।—

ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্ন-ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কবীর বলে, শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধুর কণ্ঠে এই গান গেয়ে ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করলেন। ভক্ত-সভায় ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হল। বঙ্কিমাদি ভক্তবৃন্দ সেই পূত স্রোতে অবগাহন করে ধন্য হলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পূর্ববৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ ডুব দিতে চায় না। আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে শেষ কালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত তাদের সম্বন্ধে তারা বলে, ওরা বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতসাগর। আমি

নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মনে কর, এক খুলি রস আছে; আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোন্ খানে বসে রস খাবি?" নরেন্দ্র বললে, আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, 'কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ?' নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে ডুবে মরে যাব। আমি বললাম, "বাবা, সচ্চিদানন্দ রস তা নয়। এ রস অমৃত। এতে ডুবলে মানুষ মরে না। এতে পড়লে মানুষ অমর হয়। তাই বলছি, 'ডুব দাও। কিছু ভয় নাই, ডুব দিলে অমর হবে।'

এখন বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন এবং নম্রভাবে বললেন, "মহাশয়, আমাকে যত আহাম্মক ঠাউরেছেন আমি তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহ করে আমার কুটীরে একবার পায়ের ধূলা দেবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে হবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, "সেখানেও অনেক ভক্ত আছে।" ইহা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা 'গোপাল' 'গোপাল' 'কেশব' 'কেশব' বলেছিল তাদের মত কি?" ঠাকুরের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। এক ভক্ত ঠাকুরকে উল্লিখিত গল্পটি বলতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধে ঠাকুরও নিম্নোক্ত গল্পটি সরস করে বললেন।

এক স্থানে কোন স্যাকরার দোকান ছিল। তারা পরম বৈষ্ণব; গলায় মালা পরে ও কপালে তিলক কাটে। তারা হরিনামের ঝুলি হাতে নিয়ে মুখে সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করে। তারা এত ভক্ত যে, তাদিগকে সাধু বলাই চলে। তবে পেটের দায়ে সংসারের

জন্য তারা স্যাকরার কাজ করে। তারা পরম ভক্ত শুনে অনেক খরিদ্দার তাদের দোকানেই আসে। লোকের বিশ্বাস, এই দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার সেই দোকানে গিয়ে দেখে যে, স্যাকরা মুখে হরিনাম করছে, আর হাতে গয়না গড়ছে। খরিদ্দার সেই দোকানে গিয়ে বসল। একজন স্যাকরা বলে উঠল, কেশব! কেশব! কেশব। কিছুক্ষণ পরে আর একটি স্যাকরা বলতে লাগল, গোপাল! গোপাল! গোপাল। সামান্য কথাবার্তার পর আর একজন চীৎকার করে বলল, হরি! হরি! হরি। গয়না গড়ার কথা যখন প্রায় ফুরিয়ে এল তখন আর একজন বলল, হর! হর! হর। স্যাকরাদের ভক্তিভাব দেখে খরিদ্দার তাদের কথামত টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল এবং ভাবল, এরা কখন ঠকাবে না।

কিন্তু আসল কথা হল অন্য রকম। খরিদ্দার আসার পর যে বলেছিল 'কেশব' 'কেশব' তার মানে—এরা সব কে? যে বললে, 'গোপাল' 'গোপাল' তার মানে—এরা দেখছি গরুর পাল। যে বললে, 'হরি' 'হরি' তার মানে—যখন এরা গরুর পাল তবে হরি অর্থাৎ এদের সোনারূপা হরণ করি। আর যে বললে, 'হর' 'হর' তার মানে, এরা যখন গরুর পাল দেখছ তখন এদের সর্বস্ব হরণ কর। স্যাকরারা পরম ভক্ত হয়েও ভাবের ঘরে এমনি চুরি করেছিল। ভাবের ঘরে চুরি থাকলে, মন-মুখ এক না হলে ধর্ম হয় না।

ঠাকুরের গল্প শুনে সকলে উচ্চ হাস্য করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য-মনস্ক হয়ে বিদায় নিলেন। দরজার কাছে গিয়ে তাঁর মনে হল, চাদর ফেলে গেছেন। কোন ভদ্র লোক চাদর খানি নিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে দিলেন। কিছু দিন পরে ঠাকুর গিরীশ ও শ্রীমকে সানকি

ভাণ্ডায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। ঠাকুরকে আবার দেখবার ইচ্ছাও তিনি তখন প্রকাশ করেন। কিন্তু কার্যগতিকে তিনি ঠাকুরের কাছে আর যেতে পারেন নি, কিংবা ঠাকুর আর তাঁর বাড়ীতে আসেন নি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পঞ্চবটিতলায় ভক্তসঙ্গে সানন্দে বসে ছিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী'র কিয়দংশ তিনি শুনে ছিলেন। তিনি চাতালের উপর সমাসীন ছিলেন। কেদার চট্টোপাধ্যায়, রাম দত্ত, নিত্য গোপাল, তারক ঘোষাল, সারদাপ্রসন্ন, সুরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীম 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ করে শুনালেন। তা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।

তিন

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদও লাভ করেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা-বিবাহ আইন সরকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। তিনি অসাধারণ

সাহিত্যিক ছিলেন এবং বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ, বিদ্যাসাগর স্কুল ও বিদ্যাসাগর স্ট্রীট হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঘাটালে তাঁর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে কলেজ এবং স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৫৯ সাল শ্রাবণ মাসে (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগস্ট) শনিবার বৈকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতা নগরীর বাদুড় বাগান পল্লীতে বর্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বিদ্যাসাগরের বাটী অবস্থিত। উক্ত বাড়ীতেই এই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত) ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ও দয়ার কথা শুনে ছিলেন। তিনি একদিন স্বশিষ্য শ্রীমকে বললেন "আমাকে কি বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে? তাকে দেখতে আমার বড় সাধ হয়" শ্রীম এই কথা বিদ্যাসাগরকে বললেন। ইহা শুনে বিদ্যাসাগর একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করেন, 'কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন?' শ্রীম'র মুখে ঠাকুরের আসল বর্ণনা শুনে বিদ্যাসাগর আনন্দিত হন এবং এক শনিবার বৈকালে চারটার সময় তাঁকে সঙ্গে করে স্বীয় গৃহে আনতে বলেন।

তদনুসারে উল্লিখিত দিবসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকা গাড়ীতে চড়ে শ্রীম, ভবনাথ ও হাজরাকে সঙ্গে নিযে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ঠাকুর ঘোড়াগাড়ী হতে ফটকের সম্মুখে নামলেন। শ্রীম তাঁকে পথ দেখিয়ে বাটীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাকুর বালকবৎ জামার বোতামে হাত দিযে শ্রীমকে বললেন, "আমার জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এতে কিছু দোষ হবে না তো?" শ্রীম নম্র ভাবে নিবেদন করলেন, "আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।" শ্রীম'র কথায় ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন। ঠাকুরের গায়ে লংক্লথের জামা, পরিধানে লাল পেড়ে ধুতি ও পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতা।

পরিহিত বস্ত্রের আঁচলটি তাঁর কাঁধে ফেলা ছিল। ঠাকুর দোতলায় উঠে বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করলেন। বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে দেখে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি ষোল সতের বৎসর বড় ছিলেন। তাঁর পরণে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা ও গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেল জামা ও গলায় উপবীত। পরমহংস ও বিদ্যাসাগরের মিলন দিব্য দৃশ্য সৃষ্টি করল। ঠাকুর বাম হাত টেবিলের উপর রেখে ভাবাবেশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরকে দেখতে লাগলেন। এমন সময় বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীয়-বন্ধুরা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বেঞ্চের উপর বসলেন। বেঞ্চটিতে হেলান দিবার ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুর ভাবাবেশ সম্বংণার্থ মাঝে মাঝে বলে উঠলেন; "জল খাব।" এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর ব্যস্ত ভাবে একজনকে জল আনতে বললেন এবং শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন কি? শ্রীম সম্মতি জানালে বিদ্যাসাগর বাড়ীর ভেতর গিয়ে কিছু মিঠাই নিয়ে এলেন এবং ঠাকুরকে খেতে দিলেন। ভবনাথ ও হাজরা প্রভৃতি যাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে ছিলেন তাঁরাও কিছু কিছু মিঠাই খেলেন। মিষ্টি মুখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন। দেখতে দেখতে এক ঘর লোক হল; কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল, হৃদ নদী দেখেছি; এবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে খানিকটা নোনা জল নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীর-সমুদ্র!

ঠাকুরের কথা শুনে সমবেত সকলেই আনন্দে হাসতে লাগলেন।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন, "তা বলতে পারেন বটে।" বিদ্যাসাগর নির্বাক্ হয়ে রইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কর্ম সাত্ত্বিক, সত্ত্বের রজ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায় তা রাজসিক বটে। কিন্তু এই রজগুণ সত্ত্বের রজ; এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষাদানার্থে। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ। এও ভাল। নিষ্কাম ভাবে করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ দান করে নামের জন্য। কেউ দান করে পুণ্যের জন্য। তাদের দান নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি তো আছই।

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু-পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নও গো। যাদের শুধু পাণ্ডিত্য আছে তারা দরকচা পোড়া। তাদের না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে; কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে। যাদের শুধু পাণ্ডিত্য আছে, দয়াদি নাই তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকে। তারা শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। তাদের আসক্তি অবিদ্যার সংসারে গভীর। দয়া, ভক্তি ও বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর নীরবে ঠাকুরের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনলেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁর কথামৃত পান করে ধন্য হলেন। যেখানে ঠাকুর থাকতেন ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন সেখানে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্ট হত। ঠাকুরের উপস্থিতিতে ও ভগবৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বৈঠকখানা তীর্থ

ক্ষেত্রে পরিণত হল। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত, ষড়্দর্শনজ্ঞ। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। ব্রহ্ম মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া দুইই আছে। ইহলোকে জ্ঞান-ভক্তি আছে; আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে; সৎও আছে আবার অসৎও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ে, কেউ বা জাল করে। কিন্তু প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দেয়, আবার দুষ্টের উপর আলো দেয়। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এই সব তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম অনাসক্ত। সাপের মুখে বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে, মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারিত হয়েছে। এই সব তাই এঁটো হয়ে গেছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সেটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—বা! বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক বাপের দুটা ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্য ছেলে দুটাকে বাপ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল। এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে।

বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপ, তুমি ত সব পড়েছ। ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি ?" বড় ছেলেটী বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন তিনি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁট মুখে চুপ করে রইল। তার মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বল্‌লেন, 'বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে সমস্ত পাহাড় মুখে করে নিয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। তারা জানে না যে, ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত। যে যত বড় হউক না কেন তাঁকে কি করে জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেঁও পিঁপড়ে, চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক!

বেদ পুরাণে যা বলেছে, সে কি রকম বলা জান ? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে ? সে মুখ হাঁ করে বলে, "ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!" ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে, তিনি আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ! শুকদেবাদি এই ব্রহ্ম-সাগরের তটে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবারি দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। একমতে আছে, তাঁরা এই সাগরে নামেন নাই। এই সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই। সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু, তা মুখে বলবার শক্তি থাকে

না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। (সকলের হাস্য)। সমুদ্রের জল কত গভীর তাই খপর আনতে। খপর আনা আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবে ?

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, "সমাধিস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী কি আর কথা কন না?" শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিলেন (বিদ্যাসাগরাদিকে লক্ষ্য করিয়া)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শংকরাচার্য্য লোক-শিক্ষার জন্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিতে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর একবার ছ্যাঁক্, কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দানের জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন ভন করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনো গুণ গুণ করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। কলসী পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি জল ঢালাঢালি হয় তবে আবার শব্দ হয়।

ইহার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন তাতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অপূর্ব সমন্বয় সূচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়-মূর্তি। তিনি স্বীয় জীবনে সাধনা দ্বারা যাহা উপলব্ধি করেছেন তাহাই উপদেশ দিতেন। এই সম্বন্ধে বীরভক্ত

হনুমানের উক্তি প্রাসঙ্গিক। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহম্ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

অনুবাদ—হে রাম! দেহবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমি তোমার দাস, জীববুদ্ধির প্রাবল্যে আমি তোমার অংশ এবং আত্মবুদ্ধির আলোকে তুমিই আমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়-বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কত খাটতেন। তারা সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেতেন। একলা সারা দিন নির্জনে ধ্যানজপ করতেন এবং রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেতেন। দেখা, শোনা ও ছোঁয়া—এসব বিষয় থেকে তাঁরা মনকে আলাদা রাখতেন। তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করতেন।

কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এই অবস্থায় সোঽহং বলা ভাল নয়॥ সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না তাদের 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এই অভিমান ভাল। ভক্তি-পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। জ্ঞানী নেতি নেতি বলে, বিষয়-বুদ্ধি সব ত্যাগ করে। তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি, তিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং আরো কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিষে তৈরী, সেই ইট, চুণ,

সুরকীতেই সিঁড়িও তৈরী। নেতি নেতি করে যাকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

ছাদে অনেক ক্ষণ লোকে থাকতে পারে না। আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব-জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা রে গা মা পা ধা নি—এই সপ্ত স্বর। শেষ স্বর 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। কলিযুগে কিছুতেই 'আমি' যায় না। সমাধিতে দেখা যায় তিনিই আমি। তিনিই জীব-জগৎ সব। এরই নাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান। জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞান যোগও সত্য, ভক্তিযোগও সত্য। সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তবে তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন ততক্ষণ ভক্তি-পথই সোজা।

বিজ্ঞানী দেখে, ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয় ও সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ব, রজ, তম তিন গুণে হয়েছে; কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনি ত্রিগুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্য-শালী ভগবান। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই সব তাঁর ঐশ্বর্য। যে বাবুর ঘর-বাড়ী নাই, হয়ত বিকিয়ে গেছে সে আবার কিসের বাবু! (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যশালী। যদি তাঁর ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে তাঁকে কে মানত? (সকলের হাস্য)। দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার!—কত রকম জিনিষ, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, কত প্রকার জীব! বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারো বেশী শক্তি, কারো কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর—তিনি কি কাউকে কম শক্তি, কাউকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন, পিঁপড়েতে পর্যন্ত ; কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোক দশ জন লোককে হারিয়ে দেয় ; আবার কেউ এক জনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন ? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো ? (হাস্য)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা অন্যের চেয়ে অনেক বেশী। তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মান কি না ?

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃদু হাস্য করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে বুঝাতে লাগলেন যে, ভক্তিই সার এবং শুধু পাণ্ডিত্য অসার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায় জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে একজন জিজ্ঞাসা করলে। সাধু পুঁথি খুলে দেখালে, পাতায় পাতায় লেখা আছে—ওঁ রাম ; আর কিছুই লেখা নাই। গীতার অর্থ কি জান ? দশ বার গীতা বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' পাঁচ দশ বার বললে তাগী তাগী হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবান লাভের চেষ্টা কর। সাধুই হোক, আর সংসারীই হোক ; মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। তবে তাঁকে পাওয়া যাবে।

চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন তখন দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে, আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে। কেঁদে তার চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন,

তুমি এসব বুঝতে পারছ ? সে বল্‌লে, "ঠাকুর ! আমি শ্লোকাদি কিছু বুঝতে পারছি না।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কাঁদছ কেন ? ভক্তটী বললে. "আমি দেখছি, অর্জ্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) ও অর্জুন কথা কইছেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে ? এর উত্তর, 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে ; কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তারপর দিন দেখবে, ফেকড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)। জ্ঞান লাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তার পর জাগলে। তবুও তোমার বুক দুড় দুড় করছে ! জীবের 'আমি' নিয়েই ত যত যন্ত্রণা ! গরু হাম্বা (আমি) হাম্বা করে। তাই ত অত যন্ত্রণা। তাকে লাঙ্গলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি তার গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে। তার চামড়ায় জুতা হয়, ঢোল হয় ; তখন খুব পেটে। (হাস্য)। তবুও নিস্তার নাই ! শেষে নাড়াভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয় ! সেই তাঁতে ধুনুরির যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না ! তখন বলে তুহুঁ, তুহুঁ (অর্থাৎ তুমি, তুমি)। যখন তুমি তুমি বলে, তখন নিস্তার। 'হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু ; আমি ছেলে, তুমি মা' এই ভাব আশ্রয় করলে জীব রক্ষা পায়।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান তুমি আমায় কি ভাবে দেখ ? হনুমান বল্লে, "রাম, যখন আমি বলে আমার বোধ থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। সাধারণের পক্ষে

সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি'ত যাবার নয়; তবে থাক্ শালা দাস 'আমি' হয়ে। 'আমি' ও 'আমার' এই দুটী অজ্ঞান। 'আমার বাড়ী', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য্য'—এই ভাব অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আর এসব তোমার জিনিষ, বাড়ী পরিবার ছেলেপুলে লোকজন বন্ধু-বান্ধব এ সব তোমার জিনিষ—এইভাব জ্ঞান থেকে হয়।

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর আর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা—যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার। বাগান যদি কেউ দেখতে আসে তা বলে, এই বাগানটী আমাদের। এই পুকুর আমাদের। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি তাকে ছাড়িয়ে দেয় তার আম কাঠের সিন্ধুকটা নিয়ে যাবার সাহস থাকে না। দারোয়ানকে দিয়ে সিন্ধুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)। ভগবান দুই কথায় হাসেন! কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব' তখন একবার হাসেন। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা। ঈশ্বর যে কর্তা এ কথা সে ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন। এই মনে করে তিনি হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড; কিন্তু ওরা বলছে, এ জায়গা আমার, ও জায়গা তোমার তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক। তবেই তাঁর কৃপা হবে।

অনন্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ভাব ?" এই প্রশ্ন শুনে বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসলেন এবং বললেন, "আচ্ছা, সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলবো।" কিন্তু ঠাকুরকে বিদ্যাসাগর আর সে কথা বলতে পারেন নাই। উভয়ের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববৎ ধর্মপ্রসঙ্গ করতে লাগলেন এবং বললেন, তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না! এই বলে তিনি মধুর কণ্ঠে প্রেমোন্মত্ত হয়ে সাধক রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত কালীসঙ্গীত গাইলেন।—

কে জানে কালী কেমন ?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্ম-বনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালের মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুনলে, 'কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।' আর বলেছে, 'ষড়দর্শনে না পায় দর্শন'। পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। বিশ্বাসের কত জোর শুন। একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হবে। বিভীষণ বললে, এই জিনিষটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নাও; তা হলে নির্বিঘ্নে

চলে যাবে জলের উপর দিয়ে; কিন্তু খুলে দেখ না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এত জোর! খানিক দূর গিয়ে ভাবলে, বিভীষণ এমন কি জিনিষ বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারছি। এই বলে কাপড়ের খুঁটটি খুলে সে দেখলে যে, শুধু রাম নাম লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ এই জিনিষ! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া! অবিশ্বাস আসায় সে প্রাণ হারাল। কথায় বলে, রামনামে হনুমানের এত বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বাসের বলে সে সাগর লঙ্ঘন করলে; কিন্তু স্বয়ং রামকে সাগর বাঁধতে হল! যদি তাতে বিশ্বাস থাকে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক কিছুতেই ভয় নাই।

এই বলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি-ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বিশ্বাসের মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত মাতৃসঙ্গীত গাইলেন।—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এদীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপান আদি বিনাশী নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

এই গান গেয়ে ঠাকুর বললেন, "বিশ্বাস আর ভক্তি থাকলে তাঁকে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।" এই কথা বলতে বলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি রামপ্রসাদী সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করলেন। এই গান গাইতে গাইতে তিনি সমাধিস্থ হলেন। তিনি সমাধি-মন্দিরে। তাঁর হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ; দেহ উন্নত ও অটল, নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। তিনি পা ঝুলিয়ে বেঞ্চের উপর

পশ্চিমাস্য হয়ে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধ হয়ে এই দিব্য দৃশ্য দেখতে লাগলেন। ঠাকুর কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার সহাস্যে ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন।

ভাব ও ভক্তি মানে তাঁকে ভালবাসা। যিনি ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে। "প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে, সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।" রামপ্রসাদ মনকে বলছেন ঠারে ঠোরে বুঝতে। এই বুঝতে বলছেন যে, বেদে যাকে ব্রহ্ম বলেছে তাকেই আমি 'মা' বলে ডাকছি। যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যা শক্তি বলি, মহাকালী বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। অগ্নি বললেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা শক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়। একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। মা বড় ভালবাসার জিনিষ কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাস হলে তিনি দেখা দেন। আর একটা গান শোন।

এই বলে ঠাকুর আর একটি মাতৃসঙ্গীত গাইলেন। গানের এক অংশে আছে, "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়। কালীপদ সুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয়। পূজা হোম যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—চিত্ত তদগত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা চাই। সুধা-হ্রদ কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর

হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এযে সুধার হ্রদ, অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে। এতে ডুবে গেলে কেউ মরে না, অমর হয়। পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়, যদি ভক্তি না থাকে। তাঁর উপর ভালবাসা এসে গেলে এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায় ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয় তখন পাখা রেখে দিতে হয়।

তুমি যে সব কর্ম করছ এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরে ভক্তি ভালবাসা আসে, ঈশ্বর লাভ পর্যন্ত হয়। কিন্তু তাঁর উপর যত ভালবাসা আসবে ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহ-বধূর পেটে যখন ছেলে হয় তখন শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে শাশুড়ী তার কর্ম কমায়, দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য)। তুমি যে সব কর্ম করছ এতে তোমার নিজেরই উপকার। নিষ্কাম ভাবে সৎকর্ম করতে পারলে চিত্ত শুদ্ধি হবে, ঈশ্বর লাভ হবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করেন।

যিনি চন্দ্র, সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ, মহতের মধ্যে দয়া এবং সাধুভক্তের হৃদয়ে ভক্তি দিয়েছেন তিনিই জগতের উপকার করছেন।

তোমার অন্তরে সোণা আছে, এখনো খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহ-বধূর ছেলে হলে ছেলেটিকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে, গৃহের কাজ

কর্ম সে আর করতে পারে না। (সকলের হাস্য)। আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে সে দেখে, চন্দন গাছ! আবার কিছু দিন পরে সে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। আরও এগিয়ে গিয়ে সে দেখে, রূপার খনি। আর কিছুদিন পরে আরও এগিয়ে গিয়ে সে সোণার খনি দেখল। তারপর কেবল হীরা মাণিক। এসব নিয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।

নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ঈশ্বরে ভক্তি হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি।

সকলে নিঃশব্দে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনছেন। রাত্রি প্রায় নয়টা হল। এবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন। বিদায় নেবার পূর্বে তিনি সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সহিত আরও কয়েকটি কথা কইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জান, তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না, চাকর-বাকরের নাম বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিষ আছে। (সকলের হাস্য)। একবার রাসমণির বাগান দেখতে যাবেন, ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—আপনার কাছে যাব বই কি। আপনি এলেন, আর আমি যাব না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে ? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি! এমন কথা বললেন, আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলে ডিঙ্গী। খাল, বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ; যেতে যেতে চড়ায় পাছে লেগে যান। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ই হাসতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আবার বললেন, নদীর মধ্যে এখন জাহাজও যেতে পারে। বিদ্যাসাগর রসিকতার সহিত উত্তর দিলেন, হাঁ এটা বর্ষাকাল বটে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে গাত্রোত্থান করলেন। আত্মীয় বৃন্দ সহ বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলে দিতে এলেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র করে জপ এবং ভাবাবিষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগরের কল্যাণ কামনা করছেন। বিদ্যাসাগর সিঁড়ি দিয়ে আগে নামছেন ও হাতে বাতি নিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। ঠাকুর একটি ভক্তের হাত ধরে নামছেন। ফটকের কাছে এসে বিদ্যাসাগর গাড়ী ভাড়া দিতে চাইলেন; কিন্তু শ্রীম বললেন, ভাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর প্রমুখ সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঘোড়াগাড়ী দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে যেতে লাগল। বিদ্যাসাগর অনেকক্ষণ গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ঠাকুরের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয় নাই।

চার

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালের স্বনামধন্য উকিল, অধ্যাপক, স্বদেশসেবক ও সমাজ সংস্কারক। ১৮২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বরিশাল জেলার বাটাজোর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্ত কলিকাতা ছোট আদালতের বিখ্যাত জজ ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ভক্তি যোগ' একখানি পাঠক প্রিয় ধর্মগ্রন্থ এবং ইংরাজিতে অনূদিত। জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও কালীশ পণ্ডিত প্রভৃতির সহযোগে বরিশালে তিনি 'লিট্‌ল ব্রাদার্স অব দি পুয়োর' (দরিদ্র সেবক ভ্রাতৃ সংঘ) প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজি বিশ্বকোষে ইহা উল্লিখিত হয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীঃ এম. এ., বি. এ. পাশ করে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় মনোমত না হওয়ায় উহা ছেড়ে দিয়ে তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি তদানীন্তন বঙ্গদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে বরিশালে একটী হাই স্কুল ও একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ তৎকর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি অন্যতম কংগ্রেস নায়ক ও জনসেবক ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য নির্বাসিত হন। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বহুমূত্ররোগে কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ৪৫ বার দর্শন করেন। এই কয় দিনে ঠাকুরের নিকট যা তিনি পেয়ে ছিলেন তা তাঁর জীবনকে মধুময় করে রেখেছিল। তাঁর পিতা ব্রজ মোহন দত্তও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন এবং একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট তিন দিন বাস করেন।

অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শারদীয়া অবকাশের সময়। সে দিন কেশবচন্দ্র সেন এবং রাজেন্দ্র লাল মিত্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার কলিকাতা হতে নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে যান এবং কালীবাড়ীর ঘাটে নেমে একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "পরমহংস কোথায়?" কালীবাড়ীর উত্তর দিকেব বারান্দায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে এক ব্যক্তি বসেছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসিত আগন্তুক বললেন, "এই পরমহংস।" কালপেড়ে ধুতি পরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বসেছিলেন। তিনি পা দুটী উঁচু করে এবং দুই হাতে জড়িয়ে ধরে অর্ধচিৎ অবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁর ডান দিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বসে ছিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন ভক্তবৃন্দ সহ এলেন এবং ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুরও তাঁকে প্রতিপ্রণাম করলেন। কেশবের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি কেশবকে বলেছিলেন, "যত দিন মায়া থাকে তত দিন মানুষ ডাবের মত। নারিকেল যতদিন ডাব থাকে তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই তৎসঙ্গে মালার একটু উঠে আসে। আর মায়া চলে গেলে মানুষ হয় ঝুনো নারিকেলের মত। শুক্‌নো নারিকেলের শাঁস ও মালা পৃথক্ হয়ে যায়। তখন শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে; আত্মা হয় আলাদা, আর শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না। এই যে 'আমি' ঐটাই বড় মুশ্‌কিল বাধায়। শালার 'আমি' কি যাবে না? এই পোড়ো বাড়ীতে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে। এটি খুঁড়ে ফেলে দাও, আবার পরদিন দেখবে, আর এক ফেঁকড়ি গজিয়েছে।

আমাদের 'আমি'ও তদ্রূপ। পেঁয়াজের বাটি সাত বার ধুলেও গন্ধ যায় না।"

তৎপরে কেশবচন্দ্রকে আরো কিছু ধর্মকথা বললেন। এক বা দেড় ঘণ্টা পরে কীর্তন আরম্ভ হল। ঠাকুর কীর্তনানন্দে নাচতে লাগলেন তাঁকে ঘিরে কেশবপ্রমুখ ভক্তবৃন্দও নৃত্যরত হলেন। কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর সমাধিস্থ। ঠাকুরকে সমাধিস্থ দেখে অশ্বিনী কুমার অসীম আনন্দে অভিভূত হলেন। এই সম্বন্ধে তিনি শ্রীমকে লিখেছিলেন, "তখন যা দেখলাম তা বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলবো না।" ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার শ্রীরামপুরের কয়েকটি যুবক সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান। ঠাকুর যুবকবৃন্দকে দেখে সন্তুষ্ট হন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরা এসেছেন কেন?

অশ্বিনীকুমার—আপনাকে দেখতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় দেখবে কি? এরা সব বিল্ডিং টিল্ডিং দেখুক না।

অশ্বিনীকুমার—এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে এরা বুঝি চকমকি পাথর, ভিতরে আগুন আছে। হাজার বছর জলে ফেলে রাখার পরেও যেমন চকমকি পাথর ঠুকবে অমনি আগুন বেরুবে। এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব? আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?

ঠাকুরের কথা শুনে অশ্বিনীকুমার মৃদু হাসলেন। সেদিন অন্যান্য কথোপকথনও হয়েছিল। আর একদিন অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে

গিয়ে ঠাকুরকে প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই যে কাক খুললে ফস্ ফস্ করে উঠে একটু টক একটু মিষ্টি তার একটা এনে দিতে পার?

অশ্বিনীকুমার—লেমনেড?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, আন না।

অশ্বিনীকুমার তদনুযায়ী একদিন একটি লেমনেড নিয়ে এলেন। উক্ত দিন অন্য কোন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন না। সেইজন্য অশ্বিনীকুমার তাঁকে সেদিন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অশ্বিনীকুমার—আপনার কি জাতিভেদ আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ীতে চড়চড়ী খেয়েছি। তবু এক দিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়ীওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল। তা কেমন খেতে ইচ্ছা হল না। আবার একটু পরে একজন তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল। ক্যাচড় ম্যাচড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জান, জাতিভেদ আপনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না ঐ শ্যালাদের মত।

অশ্বিনীকুমার—কেশব বাবু কেমন লোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, সে দৈবী মানুষ।

অশ্বিনীকুমার—আর ত্রৈলোক্য বাবু?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ লোক। বেড়ে গায়।

অশ্বিনীকুমার—শিবনাথ বাবু?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ মানুষ। তবে বড় তর্ক করে সে।

অশ্বিনীকুমার—হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তফাৎ আর কি? এই খানে রোসন চৌকি বাজে। একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে। আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মরা নিরাকারের ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে। জল আর বরফ, নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়। জ্ঞানের গরমাতে বরফ গলে জল হয়, আর ভক্তির হিমে জল জমে বরফ হয়। সেই একই জিনিষ। নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরেব চার পাশে চাব ঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে জল। ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে, বলবে 'পানি'; অন্য ঘাটে বলে এ্যাকোয়া। আর এক ঘাটে বলে ওয়াটার। নাম ভিন্ন হলেও জল ত একই।

অশ্বিনাকুমার—বরিশালে অচলানন্দ তীর্থাবধুতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই কোতরঙ্গের রামকুমার ত?

অশ্বিনীকুমার—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাকে কেমন লাগলো?

অশ্বিনীকুমার—খুব ভাল লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, সে ভাল, না আমি ভাল?

অশ্বিনাকুমার—তার সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত বিদ্বান্ লোক। আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী?

অশ্বিনীকুমারের উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে চুপ করে রইলেন। এক আধ মিনিট পরে অশ্বিনীকুমার পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করলেন।

অশ্বিনীকুমার—তা তিনি পণ্ডিত হতে পারেন ; কিন্তু আপনি মজার লোক। আপনার কাছে খুব মজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ। আমার পঞ্চবটী দেখেছ ?

অশ্বিনীকুমার—আজ্ঞে হাঁ।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমারকে পঞ্চবটীতে অনুষ্ঠিত নানা সাধনের কথা বললেন। এই সঙ্গে তাঁর গুরু তোতাপুরীর কথাও উল্লেখ করলেন। তোতাপুরী পঞ্চবটী তলায় প্রায় তের মাস অবস্থান করেন। তিনি সর্বদা ধুনি জ্বেলে রাখতেন। পঞ্চবটীর পাশে যে ক্ষুদ্র কুটীর আছে তন্মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। একবার গভীর নিশীথে তোতাপুরী ধুনির পাশে ধ্যানস্থ ছিলেন। এমন সময় পঞ্চবটী কম্পিত করে এক ব্রহ্মদৈত্য এসে ধুনির ধারে বসলেন। নির্ভীক তোতাপুরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুম্ কোন্ হ্যায় ?" ব্রহ্মদৈত্য দৃপ্তভাবে উত্তর দিলেন, আমি এই দেবস্থানের রক্ষক ব্রহ্মদৈত্য। তোতাপুরী বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে বললেন, "তুমিও ব্রহ্ম, আর আমিও ব্রহ্ম। এস, ব্রহ্মধ্যান করি।" তোতাপুরীর কথা শুনে ব্রহ্মদৈত্য অট্টহাস্য করে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। অনন্তর উভয়ের কথোপকথন চলতে লাগল।

অশ্বিনীকুমার—তাঁকে পাবো কি করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, চুম্বক লোহাকে যেমন টানে সে ত তেমনি আমাদের সর্বদা টানতেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাকলে চুম্বকের টান বুঝতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে যখন মনের ময়লা ধুয়ে যায় তখন ঈশ্বরের আকর্ষণ বুঝতে পারে এবং তাতে যুক্ত হয়।

অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি শুনে শুনে লিখে নিচ্ছিলেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হবে না। সিদ্ধি আন, সিদ্ধি বাট, সিদ্ধি খাও। তবেই তো নেশা হবে। তোমরা তো সংসারে থাক, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করবে, অথচ নেশাটি লেগে থাকবে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না যে, সিদ্ধি খেয়ে ন্যাংটো ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে। সংসারে থাকবে তো তাঁকে একখানি 'আমমোক্তার নামা' লিখে দাও, বকলমা দিয়ে দাও। তিনি যা হয় করবেন। গিরীশ বকলমা দিয়েছে। সংসারে থাকবে বড় লোকের বাড়ীর ঝির মত। ঝি বাবুর ছেলেপুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, যেন তারই ছেলে। কিন্তু মনে মনে জানছে, এরা আমার কেউ নয়। যেই জবাব দিলে, ব্যস! আর কোন সম্পর্ক নাই। যেমন কাঁঠাল খেতে হলে হাতে তেল মেখে নিতে হয় তেমনি ভক্তি-তেল মেখে নিও, তাহলে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।

এতক্ষণ উভয়ে মেঝের উপর বসে ভগবৎপ্রসঙ্গ করছিলেন। এখন তক্তপোষের উপর উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ লম্বা হয়ে শুলেন এবং অশ্বিনীকুমারকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে বললেন। অশ্বিনীকুমার তদনুযায়ী ঠাকুরকে হাওয়া করতে লাগলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "বড্ড গরম গো। পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও।" এই কথা শুনে অশ্বিনীকুমার সহাস্যে মন্তব্য করলেন, "আবার সখ তো বেশ আছে, দেখছি।" এই সরস মন্তব্য শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন এবং উত্তর দিলেন, "ক্যা-নো থাক-বে-নি?"

তখন অশ্বিনীকুমার বললেন, "তবে থাক, খুব থাক।" অশ্বিনীকুমার বলেন যে, তিনি ঠাকুরের কাছে বসে সেদিন যে বিমলানন্দ অনুভব করেছিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অশ্বিনীকুমারের শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে শনিবার বৈকালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। অশ্বিনীকুমার সেবার বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। জগদীশ বাবুকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমারকে বললেন, "আবার এটি পেলে কোথায়? বেড়ে তো। ওগো তুমি তো উকিল। উঃ বড় বুদ্ধি! আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা সেদিন এখানে এসেছিল; এখানে তিন দিন ছিল।

অশ্বিনীকুমার—তাঁকে কেমন দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ লোক। তবে মাঝে মাঝে হিজি বিজি বকে।

অশ্বিনীকুমার—আবার দেখা হলে তাঁর হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন।

এই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হাসলেন। অশ্বিনীকুমার পুনরায় ধর্মপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন।

অশ্বিনীকুমার—আমাদের গোটা কতক ধর্মকথা শোনান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হৃদয়কে চেন?

অশ্বিনীকুমার—আপনার ভাগ্নে তো? আমার সঙ্গে আলাপ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হৃদয় বলতো, তোমার বুলিগুলি সব এক বারে বলে ফেল না। ফি বার এক বুলি কেন বলবে। আমি বলতাম, তা তোর কিরে শালা? আমার বুলি আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণের সরলোক্তি শুনে অশ্বিনীকুমার হাসতে হাসতে ...লেন, "তা বটেই তো।" কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর ওঁকার উচ্চারণ ...তে করতে এই গানটি গাইলেন, "ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার ...।" গানের দুই এক পদ গাইতে গাইতেই ঠাকুরের মন রূপ-সাগরে ...ব গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। তাঁকে সমাধিস্থ দেখে ...ক্তগণের হৃদয়ে সুখ-স্রোত প্রবাহিত হল। সমাধিভঙ্গের পর ...রামকৃষ্ণ পায়চারা করতে লাগলেন এবং পরিহিত ধুতিটিকে দুই হাতে ...নতে টানতে কোমরের উপরে তুললেন। ধুতিটি কোমর হতে ...ল এদিকে ওদিকে মেঝেতে লুটতে লাগল। অশ্বিনীকুমার এবং ...গদীশচন্দ্র ঠাকুরের ধুতির অবস্থা দেখে কানে কানে পরস্পর ... বলতে লাগলেন। একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'দূর শালার ধুতি' বলে ...টা মেঝেতে ফেলে দিলেন এবং শিশুতুল্য দিগম্বর হয়ে পায়চারী ...রতে লাগলেন। উত্তর দিক হতে কার ছাতা ও লাঠি ভক্তদের ...মুখে এনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছাতা লাঠি তোমাদের? ...শ্বিনীকুমার অসম্মতি জ্ঞাপন করায় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করলেন, "আমি ...গেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ ...রতে পারি। সেই একটা লোক হাউ মাউ করে কতকগুলো গিলে ...গ। এ ছাতাটা নিশ্চয় তারই।" কিছুক্ষণ পরে তিনি ভক্তদের ...হত পূর্ব্ববৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, আমায় কি অসভ্য মনে করছ?

অশ্বিনীকুমার—না, আপনি খুব সভ্য। আবার একথা জিজ্ঞাসা ...ছেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আরে শিবনাথ টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা

এলে কোন রকমে একটা ধুতি টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরীশ ঘোষকে চেন ?

অশ্বিনীকুমার—কোন গিরীশ ঘোষ ? থিয়েটার করে যে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ।

অশ্বিনীকুমার—তাঁকে দেখিনি কখনো, তার নাম শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ভাল লোক।

অশ্বিনীকুমার—শুনি, মদ খায় নাকি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খাক না, খাক না। ক'দিন খাবে ? তুমি নরেন্দ্রকে চেন ?

অশ্বিনীকুমার—আজ্ঞে, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়। সে বি. এ. পাশ দিয়েছে, বিয়ে করেনি।

অশ্বিনীকুমার—যে আজ্ঞে, আলাপ করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ রাম দত্তের বাড়ীতে কীর্তন হবে। সেখানে সে আসবে। সন্ধ্যার সময় সেখানে যেও।

অশ্বিনীকুমার—যে আজ্ঞে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে তো ? যেও কিন্তু।

অশ্বিনীকুমার—আপনার হুকুম মানব না ? অবশ্য যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায় ?

অশ্বিনীকুমার—শুনতে পাই, পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই ছবি এক খানি তুমি আমায় দিও।

অশ্বিনীকুমার—যে আজ্ঞে। যখন আবার আসব নিয়ে আসব।

সেদিন সন্ধ্যায় রামদত্তের বাড়ীতে গিয়ে অশ্বিনীকুমার ঠাকুরকে

পুনরায় দর্শন করলেন। ঠাকুর সেদিন রাম দত্তের বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ডান পাশে উপবিষ্ট এবং অশ্বিনীকুমার তাঁর সম্মুখে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে দেখিয়ে অশ্বিনীকুমারকে বললেন, নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু সেদিন নরেন্দ্রের মাথা ধরেছিল। সেজন্য তিনি অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আলাপ করতে পারলেন না। প্রায় বার বৎসর পরে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মে বা জুন মাসে আলমোড়ায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের আলাপ হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার কথামৃতকার শ্রীমকে লিখেছিলেন, "ঐ ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে আমার জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু অতি যত্নে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! তার হাসিচ্যুত অমৃত কণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে। এই ভেবে "জয়ামি চ মুহুর্মুহু, জয়ামি চ পুনঃ পুনঃ।"

———

পাঁচ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তৎকালীন কলিকাতার অন্যতম প্রথ হোমিওপ্যাথ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা-প্রবাসী জার্ হোমিওপ্যাথ সালজারের মত তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল কলিকাতার বহুবাজা পল্লীতে যে রাস্তায় তিনি বাস করতেন উহার বর্তমান নাম মহেন্দ্রলাল সরক ষ্ট্রীট। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ তি এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে বঙ্গীয় শাখার প্রথমে সম্পাদক ও পরে সহকারী সভাপতি হন। তি ১৮৬৮ খ্রীঃ 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয় ইংরাজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও উহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। উ পত্রিকা অদ্যাপি প্রচলিত। বাংলার ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পে পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' নামক বিজ্ঞান সভা স্থাপ করেন। তিনি তথায় আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতেন। ১৮৮৭ তিনি কলিকাতা মহানগরীর সেরিফ-পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭-১৮৯৩ খ্রী পর্য্যন্ত ৬।৭ বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০৪ খ্রী জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে চিকিৎসার্থ আগমন এ তথায় কিঞ্চিদধিক তিন মাস অবস্থান করেন। তথায় আসার কয়েক দি পরেই ভক্তগণ ডাক্তার সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ এনেছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক মথুরানাথ বিশ্বাস যখন জীবিত ছিলেন তখ

তাঁর পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সরকার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সামান্যভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেই সম্ভবতঃ তিনি ঠাকুরের প্রথম চিকিৎসা করতে আসেন। তিনি বহু যত্নে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা ও রোগনির্ণয় করে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন। অনন্তর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্মালাপে স্বল্প কাল কাটিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি ভক্তদের অনুরোধে নিয়মিত পারিশ্রমিকও নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে তিনি কথায় কথায় জানতে পারলেন, ভক্তগণই তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করছেন। তিনি ভক্তগণের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হয়ে সেদিন থেকে আর পারিশ্রমিক নিলেন না এবং বললেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করে তোমাদিগের সৎকার্যে সহায়তা করবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে মহেন্দ্রলাল পরম আগ্রহে তাঁকে আরোগ্য করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি সকালে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে উপর্যুপরি কয়েক দিবস এসে ঠাকুরকে দেখতেন ও ঔষধাদির ব্যবস্থা দিতেন এবং চিকিৎসকের কর্তব্য শেষ হলে ধর্মপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করতেন। ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছে এলেই দুই চার ঘণ্টা কাটাতেন। তাঁর মূল্যবান্ সময়ের এত অধিক অংশ তথায় কাটাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার উপক্রম করলে, তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটিয়ে যাই? এতে আমারও স্বার্থ রয়েছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকি। পূর্বে তোমাকে দক্ষিণেশ্বরে দেখলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে তোমাকে জানবার অবসর তো পাইনি। তখন 'এটা করব' 'ওটা করব' এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কি জান তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে। তুমি যেটা সত্য বলে বোঝ তার এক চুল এদিক ওদিক করে চলতে বা বলতে

পার না। অন্য স্থলে দেখি, তারা বলে এক, করে আরেক। এইটে আমি আদৌ সহ্য করতে পারি না, মনে করো না। তোমার খোসামোদ করছি এমন চামা আমি নই। আমি বাপের কুপুত্র ; বাপ অন্যায় করলেও তাঁকে স্পষ্ট কথা বলে দিই। সেইজন্য দুমুখ বলে আমার দুর্নাম রটে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা শুনেছি বটে। কিন্তু এই এতদিন এখানে আসছ আমি তো তার কিছুই পরিচয় পেলাম না।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল (সহাস্যে)—সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য। নতুবা অন্যায় বলে কোন বিষয়ে ঠেকলে দেখতে, মহেন্দ্র সরকার চুপ করে থাকত না। যাই হোক, সত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভেবো না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি সেটা প্রতিষ্ঠা করতেই তো আজীবন ছুটোছুটি করেছি। এইজন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারম্ভ, এই জন্যই বিজ্ঞান চর্চার মন্দির নির্মাণ।

সমবেত ভক্তদের মধ্যে কেহ মন্তব্য করলেন, ডাক্তার বাবুর অনুরাগ অপরা বিদ্যার প্রতি ; কিন্তু ঠাকুরের ভালবাসা পরা বিদ্যার প্রতি। এতে ডাক্তার সরকার একটু উত্তেজিত হয়ে নিম্নোক্ত কথা বললেন।

ডাঃ সরকার—ঐ তোমাদের কথা! বিদ্যার আবার পরা অপরা কি? যা হতে সত্যের প্রকাশ হয় তার আবার উঁচু নীচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর তাহলে এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে, অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়ে পরা বিদ্যা লাভ করা সম্ভব। বিজ্ঞান-চর্চার ফলে আমরা যে সত্য প্রত্যক্ষ করি তা হতেই জগতের আদি কারণ বা ঈশ্বরের কথা আরো ভাল করে বুঝতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরছি না! তাদের কথা আমি আদৌ বুঝতে পারি না। চক্ষু থাকতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি

বুঝে ফেলেছেন তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী জুয়াচোর, তার জন্য পাগলা গারদের ব্যবস্থা করা উচিত।

ডাক্তার সরকারের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের ইতি যারা করে তারা হীনবুদ্ধি। তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।" এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ভক্তকে আন্তরিক অনুরাগের সহিত এই রামপ্রসাদী সঙ্গীত গাইলেন।—

কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥ *

এই গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ উহার ভাবার্থ মধুর স্বরে ডাক্তার সরকারকে মধ্যে মধ্যে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। গানের 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন' এই অংশটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ গায়ককে বাধা দিয়ে বললেন, "উঁ হুঁ। উল্‌টোপাল্‌টা হচ্ছে। 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না' এইরূপ হবে। মন তাঁকে জানতে গিয়ে সহজে বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম নয়। প্রাণ কিন্তু একথা বুঝতে চায় না। সে কেবল বলে, আমি কি করে তাঁকে পাব।"

ডাঃ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ। মন ব্যাটা ছোট লোক। একটুতেই পারব না বলে বসে। কিন্তু প্রাণ ঐ কথায় সায় দেয় না বলেই তো যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।" এই গান শুনতে শুনতে দুই একটি তরুণ ভক্ত ভাবাবিষ্ট হলেন এবং তাঁদের বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হল। এই

---

* এই পুস্তকের অন্যত্র পুরা গান দেখুন।

দেখে ডাক্তার সরকার তাঁদের নাড়ী পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষান্তে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "মূর্চ্ছিতের ন্যায় বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান এদের নাই বলে বোধ হচ্ছে।" কিছুক্ষণ পরে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ প্রকৃতিস্থ হলেন। তা দেখে ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, "এসব তোমারই খেলা বোধ হচ্ছে।" এই কথা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "আমার খেলা নয় গো, এসব তাঁরই ইচ্ছা। এদের মন এখনো স্ত্রী-পুত্র, টাকাকড়ি ও মান-যশাদিতে ছড়িয়ে পড়ে নি বলে তাঁর নাম গুণগান শুনে তন্ময় হয়ে এরা বাহ্য জ্ঞান হারায়।"

কোন ভক্ত পূর্ব প্রসঙ্গ পুনরায় তুলে ডাক্তারকে বললেন যে, একদল বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তারা অতিশয় সংকীর্ণমনা ও একদেশদর্শী।

ডাঃ সরকার—হাঁ, ঐ কথা অনেকটা সত্য বটে ; কিন্তু ওটা কি জ্ঞান ? ওটা হচ্ছে বিদ্যার গরম বা বদহজম। ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই চারটা বিষয় বুঝতে পেরে তারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটা তারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে ও দেখেছে, ঐ দোষটা তাদের হয় না। আমি ঐ দোষটা কখনো মনে আনতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছ। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি পণ্ডিত' 'আমি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সত্য ; অপরের কথা মিথ্যা'—এরূপ একটা অহংকার আসে। মানুষ নানা পাশে বদ্ধ রয়েছে। বিদ্যাভিমান তারই মধ্যে একটা। এত লেখাপড়া শিখেও তোমার ঐরূপ অহঙ্কার হয় নি, এও তাঁর কৃপা।

ডাঃ সরকার (উত্তেজিত ভাবে)—অহংকৃত হওয়া দূরে থাক মনে

হয়, যা জেনেছি বুঝেছি তা যৎসামান্য, কিছু নয় বললেই হয়। শেখবার কত বিষয় পড়ে রয়েছে। মনে হয়, শুধু মনে হয় কেন আমি দেখতে পাই, প্রত্যেক মানুষ এমন অনেক বিষয় জানে, যা আমি জানি না। সেজন্য কারো কাছ থেকে কিছু শিখতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, এদের (সমবেত তরুণ ভক্তদিগকে দেখিয়ে) নিকটেও আমার শিখবার অনেক জিনিষ আছে। এই হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধুলো নিতেও প্রস্তুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমিও ইহাদিগকে বলি, 'সখি, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' (পরে ডাক্তারকে দেখিয়ে ভক্তগণকে) ইনি কেমন নিরভিমান দেখছিস্? ভিতরে মাল আছে কিনা, তাই এরূপ বুদ্ধি।

এইরূপে অনেকক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গের পর সেদিন ডাক্তার সরকার বিদায় নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চির দিনই গুণীর সম্মান করতেন। তিনি গুণবান মহেন্দ্রলালকে ধর্মপথে অগ্রসর করে দিতে যত্নশীল হলেন। তৎশিষ্য মহেন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে তিনি সুবিদ্বান্ ডাক্তারের সহিত আলাপ করতে মধ্যে মধ্যে পাঠাতেন। গিরীশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হবার পর একদিন ডাক্তার সরকার গিরীশ ঘোষ কর্তৃক রচিত 'বুদ্ধ চরিত' নাটকের অভিনয় দেখতে যান এবং উহা দেখে শত মুখে উহার প্রশংসা করেন। তিনি পরে তৎপ্রণীত অন্যান্য কয়েকটি নাটকের অভিনয়ও দেখেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হয়ে ডাক্তার সরকার একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ এক অপরাহ্নে ঠাকুরের কাছে বসে ডাক্তার সরকারকে দুই তিন ঘণ্টা কাল ভজন

শোনালেন। নরেন্দ্রনাথের ভাবময় সঙ্গীত শুনে ডাক্তার এত আনন্দিত হলেন যে, বিদায় গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহাশীষ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "এর মত ছেলে ধর্ম্মলাভ করতে এসেছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ একটি রত্ন; এ যাতে হাতে দিবে তাতে উন্নতি লাভ করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা শুনে নরেন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে বললেন, "কথায় বলে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন। সেইরূপ ওর জন্যই তো সব গো।"

ক্রমে শারদীয়া দুর্গাপূজা আসন্ন হল। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ কোন দিন একটু ভাল কোন দিন একটু মন্দ এই ভাবে চলল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ফল বিশেষ ভাল হচ্ছিল না। ডাক্তার সরকার একদিন এসে শ্রীরামকৃষ্ণের রোগবৃদ্ধি দেখে দুঃখিত হন। তখন উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়েছিল।

ডাক্তার সরকার—নিশ্চয়ই পথ্যের কোন অনিয়ম হয়েছে। আচ্ছা, বল দেখি, আজ কি কি খেয়েছ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ এবং সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ডাদি তরল খাদ্যই খেয়েছি।

ডাঃ সরকার—তথাপি নিশ্চয়ই কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। আচ্ছা, বল ত কোন্ কোন্ আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দুই এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।

ডাঃ সরকার—এ্যাঁ! ফুল কপি খেয়েছ? এই তো খাবার অত্যাচার হয়েছে! ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুকরা খেয়েছ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক টুকরাও খাই নি। তবে ঝোলে উহা ছিল দেখেছি।

ডাঃ সরকার—খাও আর নাই খাও, ঝোলে উহার সত্ত্ব তো ছিল? সেজন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হয়েছে এবং ব্যারামও বেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো! কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয় নাই। ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলে ব্যারাম বেড়েছে—এ কথা আদৌ মনে নেয় না।

ডাঃ সরকার—এইরূপ একটুতে যে কত অপকার করতে পারে তা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলছি, শুনলে বুঝতে পারবে। আমার হজম শক্তিটা বরাবরই কম। মধ্যে মধ্যে অজীর্ণে খুব ভুগতে হত। সেজন্য খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হয়ে নিয়ম রক্ষা করে সর্বদা চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না। ঘি তেল পর্যন্ত বাড়ীতে করিয়ে নিই। তথাচ এক সময় বিষম সর্দি হয়ে ব্রঙ্কাইটিস হল, কিছুতেই সারতে চায় না। তখন মনে হল, নিশ্চয়ই খাবারে কোন প্রকার দোষ হয়েছে। সন্ধান নিয়ে তাতেও কোন প্রকার দোষ ধরতে পারলাম না। তারপর সহসা একদিন চোখে পড়ল, যে গরুটার দুধ খেয়ে থাকি তাকে চাকরটা কতকগুলো মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কোন স্থান হতে কয়েক মন কড়াই পাওয়া গিয়েছিল। সর্দির ভয়ে কেউ কড়াই ডাল খেতে চায় না বলে কিছু দিন থেকে উহা গরুকে খেতে দেওয়া হচ্ছে। মিলিয়ে দেখলাম, যখন হতে এরূপ করা হচ্ছে প্রায় সেই সময় থেকে আমার সর্দিও হয়েছে। তখন গরুকে সেই কড়াই খাওয়ান বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্দিও অল্প অল্প কমতে

লাগল। সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হতে সেবার অনেকদিন লেগেছিল এবং বায়ু পরিবর্তনাদিতে আমার চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও বাবা! এ যে তেঁতুল তলা দিয়ে গিয়েছিল বলে সর্দি হল সেইরূপ!

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য শুনে সকলে হাসতে লাগলেন। তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সেদিন থেকে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ হল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে, কোন দিন অপরাহ্ণে কোন দিন বা সন্ধ্যার পরে প্রায় নিত্য ঠাকুরের কাছে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করা অপেক্ষা তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতেই তিনি আসতেন এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে দুই তিন ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে তাঁর কথামৃত পান করতেন। আবার কোন কোন দিন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যে অদ্ভুত সমাধান পেতেন তাতে তিনি বিস্মিত হতেন। অধিক কথা বললে ও বার বার সমাধিস্থ হলে শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্ধে উঠে গলদেশের ক্ষত স্থানকে নিরন্তর আঘাত দিয়ে রোগের উপশম ব্যাহত করবে বলে ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে এই দুই বিষয়ে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় উক্ত নির্দেশ মানতে পারতেন না এবং ডাক্তার সরকারের উপস্থিতিতে প্রায় তদ্রূপ হইত। একদিন বহুক্ষণ কথোপকথন করে ডাক্তার সরকার অনুতপ্ত হয়ে বললেন, “আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকিয়েছি, অন্যায় হয়েছে। তা হোক, সারা দিন কারো সঙ্গে আর কথা বলো না; তাহলে আর কোন অপকার হবে না। তোমার

কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, তোমার কাছে এলেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম ভুলে যাই এবং দুই তিন ঘণ্টা না বসে আর উঠতে পারি না। তোমার কথা শুনতে শুনতে বুঝতেই পারি না, কোন দিক দিয়ে সময় চলে যায়। সে যাই হোক, আর কারো সহিত এরূপ অনেকক্ষণ ধরে কথা কহিও না; কেবল আমি এলে এরূপ কথা কইবে। তাতে দোষ হবে না। (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

সন ১২৯৩ সালের শারদীয়া দুর্গা পূজার মহাষ্টমী দিবসে অপরাহ্ণ চারটার সময় ডাক্তার ঠাকুরের নিকট এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ এসে সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। নরেন্দ্রনাথের সুমধুর স্বরলহরী শুনতে শুনতে সকলে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদু স্বরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন এবং কখনো বা অল্প ক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হলেন। সমবেত ভক্তগণের মধ্যেও কেউ কেউ ভাবাবেশে বাহ্য জ্ঞান হারালেন। উক্তরূপ সুবিপুল আনন্দ প্রবাহে শ্যামপুকুরস্থ গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটীর দ্বিতল কক্ষটি দিব্যভাবে জম্ জম্ করতে লাগল। ক্রমে রাত্রি সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ডাক্তার সরকার গৃহে ফিরবার জন্য গাত্রোত্থান করলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট বিদায় নিয়ে দাঁড়ান মাত্র ঠাকুর সহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে সহসা গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। ভক্তগণ কানাকানি করতে লাগলেন, এই সময় সন্ধিপূজা বলে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সেদিন তাঁর বন্ধু ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর সঙ্গে তথায় এসে ছিলেন। ডাক্তার সরকার সেদিন সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাদি স্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করেন। ডাক্তার ভাদুড়ীও ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সংকুচিত হয় কিনা দেখবার

জন্য তন্মধ্যে আঙ্গুল দিতেও ইতস্ততঃ করেন নি। উক্ত পরীক্ষার ফলে উভয় ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, বাইরে দেখতে সম্পূর্ণ মৃতবৎ প্রতীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন রূপ আলোক সম্পাত করতে পারে না। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হল এবং ডাক্তারদ্বয়ও বিস্মিত হয়ে বিদায় নিলেন।

শ্যামপুকুরের ভাড়া-বাটীতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এলেন। সেদিন ঠাকুরের ঘরে লাটু, শশী, শরৎ, মনোমোহন, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকার এসেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথন করতে লাগলেন।

ডাঃ সরকার—কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলুম। তখন বৃষ্টি হল। ভাবলুম দোরটোর খুলে রেখেছ, না কি করেছ কে জানে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্নভাবে)—বল কি গো! যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ তার যত্ন করতে হয়। কিন্তু দেখছি যে, এটা আলাদা। কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালাবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায়, দেহ আলাদা, আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, ও শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়, ঢপর ঢপর করে। যেমন খাপ আর তরবার—খাপ আলাদা ও তরবার আলাদা। তাই দেহের অসুখের জন্য তাঁকে বেশী বলতে পারি না।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ শশধর পণ্ডিতের উক্তি উল্লেখপূর্বক ঠাকুরকে

অনুরোধ করলেন, সমাধিস্থ অবস্থায় দেহের উপর মন এনে অসুখ সারাতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ একবার রোগারোগ্যের জন্য মা কালীকে প্রার্থনা করে যে দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন তা ব্যক্ত করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক দিন হল, আমার তখন খুব ব্যমো। কালী-ঘরে বসে আছি, মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু ঠিক নিজে বলতে পারলাম না। বললাম, 'মা, হৃদে বলে, তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে।' আর বেশী বলতে পারলাম না। বলতে বলতে অমনি দপ্‌ করে দর্শন হল, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম। দেখলাম, সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ। অমনি বললুম, 'মা, তোমার নাম গুন গান করে বেড়াব। দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও সেখানকার মতো।' সিদ্ধাই চাইবার যো নাই।

থিয়েটারের কোন গায়ক গান করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনে ভাবাবিষ্ট হলেন। ভক্তেরা অনেকে পুত্তলিকাবৎ উপবিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বললেন, "এ অতি শুদ্ধ। বিষয়-বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।" ডাক্তার সরকার ছোট নরেনকে বিস্মিত নয়নে দেখছেন। এখনো তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। মনোমোহন সহাস্যে ডাক্তারকে বললেন, 'ঠাকুর আপনার ছেলের কথায় বলেন, 'ছেলেকে যদি পাই বাপকে চাই না।'

ডাঃ সরকার—হুইতো! তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো। ঈশ্বরকে ছেড়ে তোমরা অবতার বা ভক্তকে নিয়ে থাকতে চাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বাপকে চাই না, তা বলছি না।

ডাঃ সরকার—তা বুঝেছি! এই রকম দুই একটা না বললে হবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ছেলে অমৃত বেশ সরল। শম্ভু রাঙ্গা মুখ করে বলেছিল, সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়, ঠাকুর সেবায় চলে। জোলো দুধকে অনেক জাল দিতে হয়, অনেক কাঠ পুড়ে যায়! ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ী, ভাল পাত্র। নিশ্চিন্ত হয়ে তাতে দুধ রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকের শীঘ্র চৈতন্য হয় না। দইপাতা হাঁড়ীতে দুধ রাখতে ভয় হয়। পাছে দুধ নষ্ট হয়, দই হয়ে যায়। তোমার ছেলের ভিতর বিষয়-বুদ্ধি কামিনী-কাঞ্চন ঢোকে নাই।

ডাঃ সরকার—বাপের খাচ্ছে কিনা, তাই। নিজের করতে হলে দেখতুম, বিষয়-বুদ্ধি ঢোকে কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, তা বটে। তবে কি জান, তিনি বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। তা না হলে হাতের ভিতর।

কামিনী-কাঞ্চন একেবারে ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়, তোমরা মনে ত্যাগ করবে। তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়, থাকবার স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধুভক্তের সেবা হয়। টাকা জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে, আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়।

ডাঃ সরকার—ডাক্তার ভাদুড়ী জমাচ্ছেন কার জন্য, না একটা বদ ছেলের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বদ ছেলে! স্ত্রীটা হয়ত নষ্ট, উপপতি করে। তোমারই ঘড়ি ও তোমারই চেন তাকে দেবে। তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ সম্ভব নয়, স্বীয় দারায় গমন দোষের নয়। তবে দুই

একটি ছেলে পুলে হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে ভাইবোনের মত থাকতে হয়।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর শনিবার শ্যামপুকুরের বাটীতে ডাঃ সরকার ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। ডাক্তারকে দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ, কারণের কারণ। ডাঃ সরকার—হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেহুঁশ হই নি।

ডাঃ সরকার—না, তুমি খুব হুঁশে আছ!

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি গাইলেন।—

> সুরাপান করিনা আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
> মন মাতালে মাতাল করে মদ মাতালে মাতাল বলে॥
> গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে।
> জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি পান করে মোর মন মাতালে॥
> মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা।
> প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে প্রসাদী সঙ্গীত শুনে ডাক্তার সরকার কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও ভাবাবেশ বেড়ে গেল। তিনি প্রেমাবেশে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়িয়ে দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর দিব্য ভাব প্রশমিত হল। তখন তিনি স্বীয় চরণ গুটিয়ে নিয়ে ডাক্তারকে বললেন, "উঃ, তুমি কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলে বসে আছি। তাঁকে ব্যারামের কথা বলবো না, তো কাকে বলব! ডাকতে হয়, তাঁকেই ডাকব।"

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের নয়ন যুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। তিনি আবার ভাবাবিষ্ট হলেন এবং ডাক্তারকে বললেন, "তুমি খুব শুদ্ধ। তা না হলে তোমার কোলে পা রাখতে পারতাম না। 'শান্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে।' বিষয় কি? ওতে কি রস আছে? টাকা-কড়ি, মান-যশ, দেহ-সুখ অনিত্য, ক্ষণিক। রাম-রস নিত্য, স্থায়ী। রাম কো যো চিনা নাই দিল চিনা হ্যায় সো ক্যারে।'

এত অসুখের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন দেখে ভক্তগণ চিন্তিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "নরেনের মুখে 'হরিরস মদিরা' গানটি শুনলে আমি থামবো।" কক্ষান্তর হতে নরেন্দ্রকে ডেকে আনা হল গান গাইবার জন্য। নরেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে এসে বিস্ময়-কণ্ঠে গান ধরলেন।—

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদ রে॥
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে।
নাচ হরি বলে দুই বাহু তুলে হরি নাম বিলাও রে॥
হরি প্রেমানন্দ-রসে অনুদিন ভাসরে।
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম নীচ বাসনা নাশরে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ আরও দুইটি ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাইলেন। গান দুইটির প্রথম পদ যথাক্রমে 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী' এবং 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।' ডাক্তার সরকার একাগ্র মনে তিনটি গান শুনলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হলে তিনি মন্তব্য করলেন, 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী' এই গানটি বেশ। ডাক্তারের আনন্দ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ছেলে

বলেছিল, বাবা, একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলত ছাড়া যাবে।" বাবা মদ চেখে বললে, "তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই; কিন্তু আমি ছাড়ছি না।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ডাক্তার প্রমুখ সকলে হেসে উঠলেন।

ভক্তগণকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সেদিন মা দেখালে দুটি লোককে। ডাক্তার তার মধ্যে একজন। এর খুব জ্ঞান হবে দেখলাম; কিন্তু শুক।" অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে ডাক্তারকে বললেন, "কিন্তু তুমি রসবে, ভক্তিতে সরস হবে।" ডাক্তার সরকার চুপ করে ঠাকুরের কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ঠাকুরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কাশীপুব বাগান বাড়ীতে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ঠাকুর স্বীয় কক্ষে শয্যাশায়ী। নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, মাষ্টার, ভবনাথ, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উপস্থিত। বাগান-বাড়ীটি ৬০।৬৫৲ টাকায় ভাড়া করা হয়েছে। নরেন্দ্র, শশী, লাটু প্রভৃতি তরুণ ভক্তরা বাগানে থেকেই ঠাকুরের সেবা করেন। রন্ধনাদি গৃহকর্মের জন্য একটী পাচক ও একটি দাসী নিযুক্ত হয়েছে। বাড়ী-ভাড়া ও অন্যান্য খরচ প্রচুর হচ্ছে। ভক্ত সুরেশ মিত্র অধিকাংশ খরচ বহন করেন এবং দোতলা বাড়ীটী তাঁরই নামে ভাড়া করা হয়েছে। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাঃ সরকারের প্রতি)—বড় খরচা হচ্ছে।

ডাঃ সরকার (ভক্তদিগকে দেখিয়ে)—এরা সব তা বহন করতে প্রস্তুত। বাগানের সব খরচ চালাতে এদের কোন কষ্ট নাই। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। এখন দেখ, কাঞ্চন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বললেন ডাঃ সরকারের কথার উত্তর দিতে ; কিন্তু নরেন্দ্র নিরুত্তর রইলেন। ডাঃ সরকার আবার কথোপকথন আরম্ভ করলেন।

ডাঃ সরকার—কাঞ্চন চাই, আবার কামিনীও চাই।

ডাঃ দত্ত—এঁর স্ত্রী রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।

ডাঃ সরকার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—দেখ্‌লে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদু হাস্যে)—বড় জঞ্জাল !

ডাঃ সরকার—জঞ্জাল না থাকলে ত সকলেই পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্‌লে অসুখ হয়। যেখানে ঠেকে, সেখানে ঝন্‌ ঝন্‌ করে, যেন শিঙ্গি মাছের কাঁটা বিঁধলো।

ডাঃ সরকার—তা বিশ্বাস হয়। তবে কামিনী না হলে চলে কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ! টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে—ঈশ্বরের সেবা ও সাধু ভক্তের সেবা করে—তাতে দোষ নাই। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার, অবিদ্যার সংসার করলে লোকে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের জননী, বিশ্বের মাতা তিনিই এই নারীরূপ ধরেছেন। এ তত্ত্ব চণ্ডীতে আছে এবং আমিও দেখেছি। এটী ঠিক ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব নারীতে মাতৃবুদ্ধি হলে, সব স্ত্রীকে 'মা' বোধ হলে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে নারীতে মাতৃবুদ্ধি আসে না। 'আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে।'

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়দিন একটু ভাল আছেন। তিনি লাইকোপোডিয়াম, নক্সভমিকাদি বহু হোমিও

ঔষধ খেয়েছেন। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। ডাঃ সরকার ৭।৮ মাস যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাঃ সরকার ও ডাঃ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বিদায় নিলেন।

শ্যামপুকুরের ভাড়া-বাড়ীতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার ডাঃ সরকার ও ডাঃ মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করতে এসেছেন। পূর্ব দিনও ডাঃ মজুমদার এসেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে একটু কথা বললেন।—

ডঃ সরকার—আবার তোমার কাশী হয়েছে। তা কাশীতে যাওয়া ত ভাল। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাতে ত মুক্তি গো! আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই।

ডাঃ সরকার—অধিক কথা ও ভাব এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল আমার যে ভাবাবস্থা হয়েছিল তাতে তোমাকে দেখলাম। দেখলাম তুমি জ্ঞানের আকর, তবে শুষ্ক জ্ঞানী, আনন্দ-রস পাও নাই।....মহীন্দ্র বাবু! কি টাকা টাকা করছো! মাগ মাগ মান মান করছো। এখন এসব ছেড়ে দিয়ে একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। ঐ আনন্দ ভোগ কর ও ধন্য হও। তাঁকে না পেলে জীবনের 'মহতি বিনষ্টি' হয়।

ডাঃ সরকার প্রমুখ ভক্তগণ নিস্তব্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করে বিদায় নিলেন।

ছয়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক হয়েছিলেন। ঢাকা জেলায় বারদী গ্রামে এবং গয়া ধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দুই সিদ্ধ পুরুষের কৃপা লাভের পরে তিনি পুনরায় হিন্দু ধর্মে অনুরাগী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য দর্শন ও পূত সঙ্গ লাভের পর তাঁর সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধনানুরাগ বৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয় এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে গেরুয়া-পরিহিত জটাধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ (১৩০৬ সালে) তিনি পুরীধামে দেহরক্ষা করেন। উক্ত তীর্থে জটিয়া বাবার মঠে তাঁর সমাধি-স্থল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ঢাকা, বেলুড় প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁর নামে মঠ বা আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে বৃহৎ বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

বিজয়কৃষ্ণ যখন ঢাকায় চিকিৎসক ছিলেন তখন তাঁর অদ্ভুত দর্শন হয়। একদিন তিনি নিজ ঘরে খিল দিয়ে বসে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেখতে পান। উক্ত দর্শন স্বীয় মাথার খেয়াল কি না জানবার জন্য সম্মুখে অবস্থিত দৃষ্টমূর্তির শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ ধরে তিনি স্বহস্তে টিপে দেখে পরীক্ষা করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলিকাতার শ্যামপুকুর

পল্লীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করেন তখন বিজয়কৃষ্ণ একদিন তাঁকে দেখতে এসে উক্ত দর্শন বিবৃত করেন। তখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে ভক্তগণের সম্মুখে এই কথা বলেন।—

বিজয়কৃষ্ণ—দেশবিদেশ পাহাড় পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম; কিন্তু (ঠাকুরকে দেখিয়ে) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি তারই কোথায় দুই আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও আধ পাই মাত্র দেখলাম। চার আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদু মৃদু হাস্যে ভক্তদিগকে লক্ষ্য করে)—বলে কি?

বিজয়কৃষ্ণ—সেদিন ঢাকাতে যেরূপ দেখেছি তাতে আপনি 'না' বললে আমি আর শুনি না। অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। ক'লকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর। যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। আসতে কোন কষ্টও নাই—নৌকা, গাড়ী যথেষ্ট। ঘরের পাশে এরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। যদি কোন পাহাড়ের চূড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত তাহলে আমরা আপনার কদর করতাম। এখন মনে করি, ঘরের পাশেই যখন এই রকম তখন না জানি বাইরে, দূর দূরান্তরে আরো কত ভাল ভাল সব সাধু আছেন। তাই আপনাকে ছেড়ে আমরা অন্যত্র ছুটোছুটি করি আর কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের কি সমুচ্চ ধারণা ছিল তাহা উল্লিখিত মন্তব্যে সুপরিস্ফুট। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত স্পর্শে এসে তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতাও বর্ধিত হয়েছিল। কীর্তন কালে ভাবাবেশে

তিনি উদ্দাম নৃত্য করতেন এবং ঘন ঘন সমাধিস্থ হতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যে ঘরে প্রবেশ করলে লোকের ঈশ্বর ধারণা পূর্ণত্ব লাভ করে তার পাশের ঘরে এসে বিজয় দ্বার খুলে দেবার জন্য করাঘাত করছে।" কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্র স্বীয় কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ দেবার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ দুই দলে বিভক্ত হয় এবং উভয় দলের নেতা বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্ট হয়। কিন্তু উভয়েই সদলে পূর্ববৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যেতেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। একদিন বিজয় ও কেশব স্ব-স্ব দল সহ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কেই অতিশয় ভাল বাসতেন এবং তাঁদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে সেদিন বলেছিলেন, "দেখ, ভগবান শিব ও রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ে ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা ঘটেছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে উভয়ের মিলন হতে বিলম্ব হল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বানরগণের আর কখনও মিল হল না। ভূতে বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলতে লাগল। কেশব, বিজয়, যাহা হবার হয়েছে। তোমাদের পরস্পরে আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নয়। উহা ভূতগণ ও বাঁদরদের মধ্যেই থাকুক।"

সন ১২৯০ সালে ১১ই অগ্রহায়ণ (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ২৬শে নভেম্বর) সোমবার কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি পল্লীতে ৮১নং চিৎপুর রোডে মণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্ম উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেন। বিজয়কৃষ্ণ সেদিন তথায় অন্যান্য ভক্তদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তখনও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য ছিলেন। মণি মল্লিকের

বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কয়েকখানি মাতৃ-সঙ্গীত গাইলেন। ব্রাহ্ম গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কীর্তন করে ছিলেন। কীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্দাম নৃত্যও করেন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ সায়াহ্ন উপাসনা করতে যাবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে গৃহান্তর হতে বৈঠকখানায় এলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কে দেখেই রঙ্গ করে বলতে লাগলেন, "আজকাল সংকীর্তনে বিজয়ের বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয়, পাছে ছাদ শুদ্ধ উলে যায়। (সকলের হাস্য)। হাঁগো, ঐরূপ একটি ঘটনা আমাদেব দেশে সত্যই হয়েছিল। সেখানে কাঠ মাটি দিয়েই লোকে ঘরের দোতলা করে। এক গোস্বামী শিষ্য বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ঐরূপ দোতলায় কীর্তন আরম্ভ করেন। কীর্তন জমতেই নাচ আরম্ভ হল। এখন গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করে) তোমারই মত হৃষ্টপুষ্ট। কিছুক্ষণ নাচবায় পরেই ছাদ ভেঙ্গে তিনি একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেরূপ ঘটে।" (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের গেরুয়া বস্ত্রধারণ লক্ষ্য করে সমবেত ভক্তবৃন্দকে বললেন, "আজকাল বিজয়ের গেরুয়ার উপরেও খুব অনুরাগ। লোকে কেবল কাপড় চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, মায় জুতা জোড়াটা পর্য্যন্ত গেরুয়ায় রঙ্গিয়েছে! তা ভাল। একটা অবস্থা হয়—যখন ঐরূপ করতে ইচ্ছা হয় এবং গেরুয়া ছাড়া অন্য কিছু পরতে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা। তাই গেরুয়া সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবার ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং ঠাকুর তাঁকে প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করলেন, "ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক তোমার।"

কথক প্রহ্লাদ-চরিত্র আলোচনা করলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু হরির নিন্দা এবং স্বপুত্র প্রহ্লাদকে বারবার উৎপীড়ন করছেন। ভক্তবর প্রহ্লাদ হরিকে করযোড়ে প্রার্থনা করলেন, "হে হরি, পিতাকে সুমতি দাও।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। তিনি ভাবাবিষ্ট। বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁর কাছে বসে আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়কে লক্ষ্য করে তিনি এই উপদেশ দিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নামগুণ কীর্তন করতে করতে ভক্তিলাভ হয়। আহা! শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানা বড়া। তবে এই রকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক; আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ, অনন্ত মত।

দেখ, ঈশ্বরকে দেখা যায়। বেদে তাঁকে 'অবাঙ্মনসগোচর' বলেছে। এর মানে তিনি বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। মৈত্রায়ণী উপনিষদে আছে, 'বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের কারণ এবং নির্বিষয় মন মুক্তির হেতু।' বৈষ্ণবচরণ বলত, তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন তাতে মুখ দেখা যায়। ময়লা জলে বা ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।

চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ হলে তবে তাঁর দর্শন মিলে। ঈশ্বর দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। তার আগে লেক্‌চার দিলে কেউ শুনে না; শ্রোতার মর্মস্পর্শ করে না। একটা গানে আছে, "ভাবছো কি মন একলা বসে, অনুরাগ বিনে কি চাঁদ গৌর আসে।" আবার একটি গানে আছে, "মন্দিরে তোর নাইক মাধব, পোদো শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল। তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে হানা।" হৃদয়-মন্দির আগে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর ঠাকুরের প্রতিমা আনয়ন ও পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজালে কি হবে?

অনন্তর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করলেন। উপাসনান্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে বসলেন। ঠাকুর তাঁকে তখন নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমরা এত পাপ পাপ বল্লে কেন? কেউ একশো বার 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' বল্লে পাপীই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? তিনি আমাদের বাপ মা। তাঁকে বলো যে, পাপ করেছি বটে; কিন্তু আর কখনো করবো না। আর তাঁর নাম জপ কর। তাঁর নাম করে জিহ্বা সার্থক কর। তাঁর নাম জপ ও গুণগান করলে দেহ-মন পবিত্র হয়।

সন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার মহাসপ্তমীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াছেন। বৈকাল বেলা তিনটার সময় তিনি গাড়ী হতে নামলেন; সঙ্গে হাজরা ও আর দুই একটি ভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ এসে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে আসনে উপবিষ্ট হলেন। একটু বিশ্রাম করে বিজয়কৃষ্ণকে তিনি নিম্নোক্ত উপদেশ দেন। গাড়ী হতে নেমে তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে লক্ষ্য করে করযোড়ে নমস্কার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্য মতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই। তাই নরেন্দ্র আমাকে বলেছিল, 'ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে কাজ নাই ; শিবনাথের বাড়ীতে যাবেন।'

আমি বলি. সকলে তাঁকেই ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক এবং যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে এই বলি যে, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ধর্ম ভুল, এই বুদ্ধি ভ্রান্ত। আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল তা আমি বুঝতে পারছি না—এই ভাব ভাল। কেন না, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতেন, "সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। সগুণ আমার মাতা, নিগুণ আমার পিতা। কাকে নিন্দা করি, আর কাকেই বা বন্দনা করি। 'দোনো পাল্লা ভারি।"

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৈদিক যুগের ব্রহ্মজ্ঞানী এবং আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলে এক বস্তুকে চাইছ। তবে যার যা পেটে সয় মা সেরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন ও তাঁর পাঁচটি ছেলে থাকে তিনি সকলকেই পোলোয়া কালিয়া করে দেন না, কারণ সকলের পেট সমান নয়। তাই কারুর জন্য মাছের ঝোলও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

আমার ভাব কি জান? আমি সব রকম মাছ খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। (সকলের হাস্য)। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি—এই সবই ভালবাসি। আবার মুড়ি ঘণ্টতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)।

কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই সত্য। কিন্তু মত ত আর ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা ধর্মমতে আশ্রয় নিলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কেউ কোন মত আশ্রয় করে ও তাতে ভুল থাকে আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধ্‌রিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক টানে জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে চলে যায় তাহলে অবশ্য পথে তাকে কেউ বলে দেয়, 'ওহে, ওদিকে যেও না। দক্ষিণ দিকে যাও।' সে ব্যক্তি কখনো না কখনো জগন্নাথ দর্শন করবে।

তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে, এই কথা আমাদের ভাববার দরকার নাই। যাঁর জগৎ সে কথা তিনিই ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে জো সো করে জগন্নাথ দর্শন হয়। তা, তোমাদের মতটী বেশত। তাঁকে নিরাকার বলছ, এত বেশ। মিছরীর রুটী সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে। তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প শুনেছ? একজন বাহ্যে করতে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল। সে এসে বন্ধুদের কাছে বললে, আমি একটী লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস গিরগিটি পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বল্‌লেন, আমি একটী সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, গিরগিটি একেবারে পাকা

সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস করত, সে এসে বল্‌লে, তোমরা যে যা বলছ সবই ঠিক। তবে জানোয়ারটা কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হল্‌দে ও কখনো নীল হয়। আর কখনো তার কোন রঙই থাকে না।

বেদে তাঁকে সগুণ নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা তাঁকে শুধু নিরাকার বলছ। এই ভাব একঘেয়ে। তা হোক। একটা ঠিক জানলে অন্যটাও জানা যায়। তিনিই সময়ে সব জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে সে এঁকে জানে, ওঁকেও জানে।

বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছেন। সেইজন্য ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁর মতভেদ ঘটেছে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বেতনভোগী আচার্য। ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর মাসিক বৃত্তি বন্ধ করে দেবার ভয় দেখাচ্ছেন। সে জন্য বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন যাবৎ চিন্তিত আছেন। অন্তর্দর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশ বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই, যেমন কামারশালের নাই। তার উপর হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু সে নির্বিকার! অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভাবে ভগবানকে চাও, এই সব সহ্য করে যাও। দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে বাস করে ঈশ্বরকে চিন্তা করত। তাদের কুটীরের চার দিকে বাঘ ভালুক প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু ঘুরে বেড়াত।

অসৎ লোকের স্বভাব বাঘ-ভালুকের মত, বিনা দোষে তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

এই চারটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম বড়লোক; তার টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে সে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়ত যা বললে তা তোমার আদৌ মনঃপূত নয়; সায় দিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে, কি ঘেউ ঘেউ করে তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তৃতীয় ষাঁড়। গুঁতুতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। চতুর্থ মাতাল। যদি তাকে রাগিয়ে দাও তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দ পুরুষ, তোর হেন তেন বলে গালাগাল করবে। তাকে বলতে হয়, 'কি খুড়ো কেমন আছ?' তাহলে খুব খুসী হয়ে সে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো টুকো আছে? আমি ভয়ে বলি, আছে। কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, কখন তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার করতে হয়। তা না হলে হয়ত তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে উল্টে তার অনিস্ট করতে ইচ্ছা হবে। তবে ফোঁস করা ভাল। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ থাকলে সদসৎ বিচার আসে।

বিজয়কৃষ্ণ—আমার অবসর অত্যল্প। এখানে নানা কাজে সদা ব্যস্ত থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা আচার্য। অন্যের ছুটি হয়; কিন্তু আচার্যের

ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসন করলে পর জমিদার তাকে আর একধার শাসন করতে পাঠান। (সকলের হাস্য)।

বিজয়কৃষ্ণ (কৃতাঞ্জলি হয়ে)—আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওসব অজ্ঞানের কথা। আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।

বিজয়কৃষ্ণ—আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহাস্যে)—এ এক রকম বেশ। সারে মাতে থাকা। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য)। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশী হলে জ্বলে যায়। সে এক রকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে—যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

কেশব সেন বাড়ীতে লেকচার দিলে। আমি তা শুনেছিলাম। অনেক লোক বসেছিল। চিকের ভিতর মেয়েরাও ছিল। কেশব বললে, "হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে ডুবে যাই।" আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহলে চিকের আড়ালে যারা রয়েছে তাদের দশা কি হবে? তবে এক কাজ কর, ডুব দাও, আবার আড়ায় উঠ। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না।

আন্তরিক ভাবে ডাকলে সংসারে থেকেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, 'তুমি' ও 'তোমার' এই ভাব জ্ঞান। সংসারে থাক, যেমন বড় মানুষের বাড়ীতে ঝি থাকে। সে সব কাজ করে, বাবুর ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে

বলে 'আমার হরি'; কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ীও আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে মনিবের সব কাজ করে; কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারের সব কর্ম কর; কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রাখ। আর জান যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র এসব আমার নয়, এসব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস। আমি মনে ত্যাগ করতে বলি, সংসার ত্যাগ করতে বলি না। অনাসক্তভাবে সংসারে থেকে তাঁর জন্য ব্যাকুল হলে তিনি দেখা দেন।

যে ভাল গায়, যে ভাল বাজায়, যে একটা বিদ্যা ভাল জানে তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের বিভূতি আছে। এটি গীতার মত। চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর তার ভিতরও সার আছে, দেবীর শক্তি আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করলেন। ব্রাহ্ম সমাজের ভক্তবৃন্দ তাঁকে নমস্কার করলেন। তিনিও তাঁদিগকে নমস্কার জানালেন। অনন্তর তিনি গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ৯ই নভেম্বর বিজয়কৃষ্ণ এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কয়েকটী ব্রাহ্ম ভক্ত এবং অন্যান্য ভক্তও উপস্থিত। শীতের আমেজ দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে তাঁর জন্য একটী সাদাসিদে জামা আনতে বলেছিলেন। শ্রীম ঠাকুরের জন্য একটী লংক্লথের জামা এবং আর একটী জিনের জামা এনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম জামাটী নিলেন; এবং দ্বিতীয় জামাটী ফেরৎ দিলেন। একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, দ্বারিক* বাবু বনাত দিছলো। আবার খোট্টারাও

---

* রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের পুত্র।

একটা বনাত আনলে। কোনটাই নিলাম না। সকলের জিনিষ নিতে পারি না।

বিজয়কৃষ্ণ—আজ্ঞে, তা বই কি? যা দরকার তা নিতে হয়। একজনকে ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবার লোক এক সেই ঈশ্বর। শ্বাশুড়ী বলে, 'আহা, বউমা! সকলেরই সেবা করবার লোক আছে। তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হতো।' বউ বল্লে, 'ওমা, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নাই।' সে ভক্তি-ভাবে ঐ কথা বল্লে।

এক ফকির আকবর বাদশাহের কাছে কিছু টাকা চাইতে গিছ্লো। বাদশাহ তখন নমাজ পড়ছেন, আর বলছে, 'হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও।' ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু আকবর শাহ তাকে বসতে ইসারা করলেন। নমাজের পর তিনি ফকিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে?' ফকির উত্তর দিলে, আপনিই খোদার কাছে ধন-দৌলত চাইছিলেন। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয় ভিখারীর কাছে কেন, খোদার কাছেই চাইবো।

বিজয়কৃষ্ণ—গয়াতে সাধু দেখেছিলাম। নিজের চেষ্টা নাই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হল। দেখি, কোথা থেকে ময়দা ঘি মাথায় করে লোকে দিয়ে গেল। ফলটলও এলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিন শ্রেণী সাধু আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম যারা, তারা খাবার জন্যও চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম ভক্ত, যেমন দণ্ডী ফণ্ডী। মধ্যম যারা, তারা 'নমো নারায়ণায়' বলে

দাঁড়ায়। যারা অধম, তারা না পেলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্য)।

উত্তম শ্রেণীর সাধু অজগর বৃত্তি আশ্রয় করে। তারা বসেই খাবার পায়। অজগর সাপের মত তারা নড়ে না। একটি ছোকরা সাধু, বালব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। একটি মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষা দিল। মেয়েটির বক্ষে স্তন দেখে ব্রহ্মচারী ভাবলে, তার বুকে ফোঁড়া হয়েছে! তাই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওটা কি?' পরে বাড়ীর গিন্নিরা তাকে বুঝিয়ে দিল যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর তার স্তনে দুধ দেবেন। তাই ঈশ্বর আগে থেকে তার বন্দোবস্ত করছেন। এই কথা শুনে ব্রহ্মচারী অবাক্। তখন সে বললে, "তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নাই। আমাকেও তিনি খাবার দেবেন।"

বিজয়কৃষ্ণ—তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না করলে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে মনে করে, চেষ্টার দরকার আছে, তার চেষ্টা করতেই হবে।

বিজয়কৃষ্ণ—ভক্তমালে এই সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বলতো?

বিজয়কৃষ্ণ—আপনিই বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তুমিই বল। আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শুনতে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুনতাম। এখন আমার সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র জানি না; এক রাম চিন্তা করি। চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় তার ছাতি ফাটে, উঁচু হয়ে সে আকাশের জল পান করতে চায়।

গঙ্গা, যমুনা, সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। কিন্তু সে পৃথিবীর জল খাবে না।

রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বার বার জল খেতে যায়; কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, "ভাই, এ কাক পরম ভক্ত, অহর্নিশি রাম নাম জপ করছে। এদিকে পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে; কিন্তু জল খেতে পারছে না। ভাবছে, পাছে খেতে গেলে রাম নাম জপ ফাঁক যায়।" হলধারীকে পূর্ণিমার দিন জিজ্ঞাসা করলুম, "দাদা, আজ কি অমাবস্যা?"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। তিনি পুনরায় সহাস্যে ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা-পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? সে বললে, "এ মহাঘোর কলিকাল। যার অমাবস্যা-পূর্ণিমা বোধ নাই তাকে আবার লোকে মানে?"

এমন সময় মহিমাচরণ এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন এবং বসতে বললেন। তিনি আসন গ্রহণ করতেই ঠাকুর পুনরায় বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ভক্তদিগকে লক্ষ্য করে স্বীয় চরিতামৃত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই অবস্থায় 'অমুক দিন' মনে থাকে না। সেদিন বেণী পালের বাগানে উৎসব ছিল, নির্দিষ্ট দিন ভুল হয়ে গেল। 'অমুক দিন সংক্রান্তি, সেদিন ভাল করে হরি নাম করব'—এই সব সংকল্পও আর মনে উঠে না। তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে।

ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা হয়। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, "হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছ। তাঁকে কিরূপ দেখে এলে আমাকে বল।" হনুমান বললে, "রাম, দেখলাম ওখানে সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে, তাঁর দেহের মধ্যে মন প্রাণ নাই। তিনি তোমার পাদপদ্মে তাঁর মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন। তাই শুধু তাঁর শরীর লঙ্কায় পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা করছে। কিন্তু কি করবে ? শুধু শরীর পড়ে আছে, মন প্রাণ তাতে নাই।"

যাকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাবে। অহর্নিশি ঈশ্বরের চিন্তা করলে তাঁর সত্তা লাভ হয়। নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে গেল। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতে উদ্দীপন হয়, তখন একবার রামনাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেরূপ হত, মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়ত। চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এই গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন ; কেন না, হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে।

যার বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে তারই ভাগবত উদ্দীপন হয়। বিষয়-রস থাকলে ঈশ্বর-ভক্তি হয় না, দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার ঘস জ্বলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে একটু ঘসলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

১৮৮৪ খ্রীঃ ২৫শে মে রবিবার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পঞ্চবটী তলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাসীন আছেন। সেদিন তাঁর ঊনপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব দিবস। বিজয়কৃষ্ণ

প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁর সমীপে উপবিষ্ট। ঠাকুর কয়েকটি গান গাইলেন এবং পরে ত্রিগুণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়কৃষ্ণের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল।

বিজয়কৃষ্ণ—সত্ত্বগুণও তবে চোর!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সত্ত্বও ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।

ভবনাথ—বাঃ! কি চমৎকার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এ খুব উঁচু কথা।

ভক্তগণ নিঃশব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বন্ধনের কারণ কামিনী ও কাঞ্চন। কামিনী ও কাঞ্চনই সংসার। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না। যে মাগ-সুখ ত্যাগ করেছে সে তো জগৎসুখ ত্যাগ করেছে। তার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজ।

বিজয়কৃষ্ণ—আজ্ঞে, তা সত্য বটে।

কিছুক্ষণ পরে কীর্তন আরম্ভ হল। সহচরী কীর্তনীয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস সম্বন্ধে গান গাইতেছে ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনতে শুনতে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সমাধিস্থ হলেন। তখন ভক্তবৃন্দ তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ, কেদারনাথ, রাম দত্ত ও মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তগণ মণ্ডলাকারে ঠাকুরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হল; কিন্তু এখনো তাঁর ভাবাবেশ আছে। বিজয়কৃষ্ণও ভাবাবিষ্ট হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজয়, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ?

বিজয়কৃষ্ণ (বিনীত ভাবে)—আজ্ঞে না।

সন ১২৯১ সাল ৪ঠা আশ্বিন (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৪ই সেপ্টেম্বর) শুক্রবার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় কক্ষে বসে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করছেন। রাধিকা গোস্বামী এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন যে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ করেন এবং সেই ভাবে পনের দিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাধিকা গোস্বামীর নিকট পঞ্চমুখে বিজয়কৃষ্ণের প্রশংসা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজয় এখন বেশ হয়েছে। হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়। রাত চারটা পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। দেববিগ্রহ দেখলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। এঁড়েদহে গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। আমি বললাম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন। সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে। চৈতন্যদেবের পটের সামনেও আবার সাষ্টাঙ্গ।

রাধিকা গোস্বামী—রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, সাষ্টাঙ্গ। আর আচারী খুব।

রাধিকা গোস্বামী—এখন তাঁকে বৈষ্ণব সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে কি বলবে, সে তা ভাবে না।

রাধিকা গোস্বামী—অমন লোককে পেলে বৈষ্ণব সমাজ কৃতার্থ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় খুব মানে। তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্বদাই ব্যস্ত। সে অতি উদার সরল। সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

সাত

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরীশ ঘোষ

বাংলার প্রথিতযশা নটবর ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ উত্তর কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বসুপাড়া লেনে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রায় ২৩৮ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৮০ খানা নাটক লিখেছেন এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে তাঁর কয়েকখানা নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাঁর কয়েক খানি নাটক হিন্দী, গুজরাটী ও আসামী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ৬২ প্রকার বিভিন্ন চরিত্রের অনবদ্য অভিনেতা ছিলেন। স্টার থিয়েটারে তৎপ্রণীত নাটক 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে সমাধিস্থ হন। চরিত্র-স্রষ্টারূপে তিনি পৃথিবীর নাট্যকারগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁর নাট্যসমূহে সাত শত চরিত্র চিত্রিত আছে; তন্মধ্যে ৪৫০ পুরুষ এবং ২৫০ মহিলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাশে গিরীশ-নাটক পড়ান হয়। তাঁর নাটকাবলী সম্বন্ধে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি ভাল বইও বেরিয়েছে। তাঁর বিস্তৃত জীবনী বাংলায় লিখেছেন ৺অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। গিরীশ ঘোষ প্রায় ৭০০।৮০০ সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি সঙ্গীত বাংলার সুদূর পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিল্বমঙ্গল', 'নসীরাম' ও 'তপোবল' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে পরিগণিত। বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ছন্দ তিনি প্রবর্তন করেন তাহা গৈরিশ ছন্দ নামে বিখ্যাত। তাঁর কয়েকটী নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অতি সরল ভাবে বিবৃত।

কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, "গিরীশ ঘোষ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তিন মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে ঠাকুরের কাছে যেতে লাগলেন।" গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে ভক্তি করতেন। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এর পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিকিৎসার্থ শ্যামপুকুরে ছিলেন তখন কালীপূজার রাত্রে তিনি কালী ভাবে আবিষ্ট হন। তা দেখে গিরীশচন্দ্র আনন্দে অধীর হয়ে 'জয় মা' বলে ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও দিব্য হাস্যে শোভিত হল; তাঁর হস্ত দ্বয় বরাভয় মুদ্রাবদ্ধ; তাঁর দেহে মা কালীর আবেশ সূচিত করল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ছিলেন সেদিন তিনি অবতার ভাবের আতিশয্যে কল্পতরু হন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা গিরীশ, তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ, যে জন্য তুমি আমাকে সকলের কাছে অবতার বলে প্রচার কর।" উক্ত প্রশ্নে আদৌ অপ্রতিভ না হয়ে পরম বিশ্বাসী গিরীশ ঘোষ নতজানু হয়ে করজোড়ে ভক্তিভরে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, "ব্যাস-বাল্মিকী প্রভৃতি মুনিগণ যার মহিমা বর্ণিতে অক্ষম আমার মত ক্ষুদ্র জীব তাঁর কথা কি বলতে পারে?" গভীর বিশ্বাস ও প্রবল ভক্তির বলে উচ্চারিত কথাগুলি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করলেন, "আর কি বলব, তোমাদের চৈতন্য হোক।"

গিরীশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কয়েকবার যাবার পরে একদিন তাঁকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে বললেন, "এখন থেকে আমি কি করব?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—যা করছ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার), দুদিক রেখে চল। তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।

এই শুনে গিরীশ কোন উত্তর দিলেন না। তাঁকে নীরব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর মনোভাব বুঝে বললেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে একবার তাঁর স্মরণ করে নিও।" কিন্তু গিরীশ এই সরল উপদেশ ও পালন করতে নিজেকে অক্ষম ভাবলেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গিরীশের দিকে তাকিয়ে ভাবাবেশে সহাস্যে বললেন, "তুই বলবি, তাও যদি না পারি? আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।" এই কথা গিরিশের মনঃপুত হল, তাঁর প্রাণ জুড়াল। তিনি ঠাকুরের চরণে দুর্বহ জীবন ভার অর্পণ করে চির তরে নিশ্চিন্ত হলেন। বকল্‌মা দেওয়ার অর্থ ভার দেওয়া। বিষয়-কর্মের ভার কাউকে দিলে সে চিঠিপত্রে ও রসিদাদিতে নিজের নামের পূর্ব্বে বঃ অর্থাৎ বকল্‌মা লিখে থাকে। তেমনি ভক্তও ধর্মজীবনের গুরুভার সিদ্ধগুরুর উপর দিয়ে থাকেন। অবশ্য অবতার পুরুষগণই বকল্‌মার ভার নিতে সমর্থ। যে ভক্ত ঠিক ঠিক ইষ্টকে বা গুরুকে বকল্‌মা দিতে পারেন তাঁর আমিত্ব মুছে যায় এবং তাঁর হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা হয়। গিরিশের মত আর কোন শিষ্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোভাবে বকল্‌মা দেন নি; তবে প্রত্যেক ভক্তের উন্নত অবস্থায় এই ভাব স্বতঃই আসে। সম্যক্ আত্ম সমর্পণে সাধনার সমাপ্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গিরীশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। তার যেমন বিশ্বাস তেমনি অনুরাগ।" শ্রীম বলেন, "গিরীশ বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায়ই তাঁর কাছে যান; হরিপদ এবং দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকেন। গিরীশ তাঁদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই বলেন।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে গিরীশ ঘোষ রচিত নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্রে'র অভিনয় দেখতে গেছেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীম, বাবুরাম, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। তখন স্টার থিয়েটার বীডন স্ট্রীটে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গালয়ে একটি বক্সে

উত্তরাস্য হয়ে বসেছেন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে। রঙ্গালয় আলোকিত ও শ্রোতৃসঙ্কুল। অভিনয়ের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশের সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ সব লিখেছ।

গিরীশ ঘোষ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তোমার ধারণা আছে। সেদিন তোমায় বলেছি, ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না। ধারণা অবশ্যই চাই। কেশবের বাড়ীতে 'নববৃন্দাবন' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডেপুটি আট শত টাকা মাহিনা পায়। সকলে বললে, সে খুব পণ্ডিত। কিন্তু সে একটা ছেলে নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে এজন্য ব্যাকুল। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, "বাবা, এটা কি? বাবা, ওটা কি?" সেও ছেলের কথায় উত্তর দিতে ব্যস্ত আছে। সে কেবল বই পড়েছে; কিন্তু তার ধারণা হয়নি।

গিরীশ ঘোষ—মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, ও থাক; ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। পাঠশালে প্রহ্লাদ লেখাপড়া করতে এসেছেন। প্রহ্লাদকে দেখে ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ' 'প্রহ্লাদ' বলতে বলতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হলেন। প্রহ্লাদকে প্রথমে হস্তীর পদতলে এবং পরে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলা হল। তা দেখে ঠাকুর কাঁদছেন! রঙ্গ-মঞ্চে দেখা গেল, গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণের দৃশ্য। তথায় নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য চিন্তিত। তা দেখে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হলেন। অভিনয় সমাপ্ত হল। রঙ্গালয়ের যে ঘরে গিরীশ ঘোষ বসেন সে ঘরে ঠাকুরকে তাঁরা নিয়ে গেলেন। গিরীশ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বিবাহ বিভ্রাট' অভিনয় কি শুনবেন ?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "না, প্রহ্লাদ চরিত্রের পর ওসব কি ? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, 'তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো।' বেশ ঈশ্বর প্রসঙ্গ হচ্ছিল। আবার 'বিবাহ বিভ্রাট', সংসারের কথা কেন ? যা ছিলুম তাই হলুম। আবার সেই আগেকার কথা এসে পড়ে।" শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভাগবত প্রসঙ্গ করছেন। তাঁর ভাবের নেশা সর্বদা লেগেই থাকত।

গিরীশ—মহাশয়, কি রকম দেখলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের মধ্যে দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের মধ্যে দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কি না, তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ বিমল আনন্দ, আর কোন সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র, উপরে হিল্লোল, কল্লোল, নীচ গভীর জল। যার ভগবান্ দর্শন হয়েছে সে কখনো পাগলের ন্যায়, কখনো পিশাচের ন্যায় হয়; তার শুচি অশুচি ভেদ জ্ঞান নাই। সে কখনো বা জড়ের ন্যায় হয়। কারণ সে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন করে অবাক্ হয়ে থাকে। সে কখনো বালকের ন্যায়, কিছুতে আঁট নাই; বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখনো বাল্যভাব, কখনো পৌগণ্ড ভাব—ফষ্টি-নাষ্টি করে। তার কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম করে। যখন সে লোকশিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।

জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য নাই ?

সূর্য ঠিক আছে। তবে 'বালকের আমি'তে দোষ নাই; বরং গুণ আছে। শাক খেলে অসুখ হয়; কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়; মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে; কিন্তু মিছরীতে কফদোষ বা অম্লবৃদ্ধি হয় না। তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী বললে তোমার দলটল থাকবে না। কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, বালকের 'আমি', দাস 'আমি' থাকলে দোষ নাই। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ হয়েছেন। তিনিই উত্তম ভক্ত।

গিরীশ (সহাস্যে)—সবই তিনি। তবে একটু আমি থাকে, কফদোষ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও আমিটুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হলে আনন্দ ভোগ করা যায়। এটি সেব্য-সেবকের ভাব। আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে, "ঈশ্বর আছেন, ঐ সেখানে"; অর্থাৎ আকাশের ওপারে (সকলের হাস্য)। গোলোকের গোপালকে দেখে আমার বোধ হল, ঈশ্বরই সব হয়েছেন। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁর ঠিক ঠিক বোধ হয়, কেবল ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা।

গিরিশ—মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, "মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতন; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।" যারা অজ্ঞ তারা বলে, 'কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।'

গিরীশ—মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কাম ভাবে করতে হয়। পরমহংস দুই প্রকার—জ্ঞানী পরমহংস, আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—আমার হলেই হল। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি—তিনি ঈশ্বর লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচ জনকে দেয়। কেউ পাতকুঁয়া খুঁড়বার সময় ঝুড়ি-কোদাল আনে। খোড়া হয়ে গেলে সে ঝুড়ি-কোদাল ঐ পাতকুঁয়াতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয়, যদি পাড়ার কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিল। গিরীশ, তুমিও পরের জন্য রাখবে।

গিরীশ—আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস কোরো, হয়ে যাবে।

গিরীশ—আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা বলে সেই শালাই পাপী হয়ে যায়!

গিরীশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সেই মাটি পর্যন্ত অশুদ্ধ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ্ করে আলো হয়?

গিরীশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয় আমি কি বলব! আমি খাই দাই, তাঁর নাম করি!

গিরীশ—আন্তরিক ভক্তি নাই; কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি! নারদ, শুকদেব এরা হতেন ত!

গিরীশ—নারদাদি ত দেখতে পাচ্ছি না, সাক্ষাৎ যা পাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা বিশ্বাস।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরব রইলেন। আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল।

গিরীশ—একটি সাধ, অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়।

সকলে নিস্তব্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ উর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে আনমনে সাধক কমলাকান্তের এই গান গাইলেন।—

> শ্যামা ধন কি সবাই পায় রে, কালী ধন কি সবাই পায়।
> অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
> শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
> ঐন্দ্র্যাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
> সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
> যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
> নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

গিরীশ—'নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়'। আহা! কি ভাব!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ঈশ্বরকে পাবো? গুরু বললেন, "আমার সঙ্গে এস।" এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে তাঁকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, "জলের ভেতর তোমার কি রকম লাগছিল?" শিষ্য বলল, "প্রাণ আটু-পাটু করছিল, যেন প্রাণ যায়!" গুরু বললেন, "দেখ, ভগবানের জন্য যদি

তোমার প্রাণ এরূপ আটু-পাটু করে তবেই তাঁকে পাবে। তাই বলি, "তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানে টান। এই তিন টান একত্র করে কেউ যদি ভগবান্‌কে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। একটী গানে আছে, 'ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর সাক্ষাৎ হবেই হবে।

সেদিন তোমায় বললুম, ভক্তির মানে কি? না, কায়মনোবাক্যে তাঁকে ভালবাসা। কায়িক ভজন—হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর কথা শোনা, ও চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। সর্বদা তাঁর ধ্যান-চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ-মনন করা মানসিক সাধন। তাঁর স্তব-স্তুতি, নামগুণগান কীর্তন করাকে বাচিক সাধন বলে। কলিতে নারদীয়া ভক্তি—সর্বদা তাঁর নামগুণ কীর্তন করা। যাদের সময় নেই তারা যেন সকালে সন্ধ্যায় হাত তালি দিয়ে এক মনে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে তাঁর ভজন করে। ভক্তির 'আমি'তে অহঙ্কার হয় না, আবদ্ধ করে না; বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ আমি আমির মধ্যে নয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি আসে। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম হয়। প্রেম রজ্জুর মত। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সাধারণ জীবের ভাব পর্যান্ত হয়। ঈশ্বরকোটী না হলে মহাভাব বা প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের মহাভাব ও মহাপ্রেম হয়েছিল। জ্ঞানযোগ কি? যে পথ দিয়ে স্ব-রূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।

প্রহ্লাদ কখনো স্বস্বরূপে থাকতেন। কখনো দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি; তখন ভক্তিভাবে থাকতেন। হনুমান বলেছিল, হে রাম, কখনো দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখনো দেখি, তুমি প্রভু, আমি দাস। হে রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি, 'তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

গিরীশ—আহা! কিন্তু সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক-বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর নিত্য, আর সব অনিত্য, দুদিনের জন্য—এই বোধ পাকা হওয়া চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে। সন্ত কবীরের এই গান শোন।—

ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় বল সে কোন জন।
কবীর বলে শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

আর একটি কথা, কামাদি কুমীরের ভয় আছে।

গিরীশ—কিন্তু যমের ভয় আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কামাদি কুমীরের ভয় আছে। তাই বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। সংসারে কারু কারু জ্ঞান হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে—গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্ত যোগী, সকলে তাদের চেনে। গুপ্ত যোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কাজ করছে; কিন্তু

দেশে ছেলে পুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে; কিন্তু সবদাই উপপতির দিকে মন ফেলে রাখে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। 'আমি কর্তা, আর এ সব জিনিষ আমার'—এই বোধ সহজে যায় না। একজনকে আমি জানি, তার নাম করবো না। সে জপ করত খুব; কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হলে সংসারেও ঈশ্বরলাভ হয়।

গিরীশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে করুণ কণ্ঠে একটি গান গাইলেন। তারপর গিরীশকে সস্নেহে পূর্ববৎ উপদেশ দিতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গানে আছে, 'তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে, ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।' মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখ না, কাছে ভগবান্ আছেন, তবু তাঁকে জানবার যো নাই, মাঝে মহামায়া আছেন বলে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা, ও সকলের পেছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত দূরে আছেন। তবু লক্ষ্মণ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না! তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব—সন্তান ভাব, দাসী ভাব ও সখী ভাব। দাসী ভাবে ও সখী ভাবে আমি অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না, ওড়না পরতুম। সন্তান ভাব খুব ভাল। বীরভাব ভাল নয়। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। এতে প্রকৃতিকে স্ত্রীভাবে দেখে, আর রমণ দ্বারা প্রসন্ন করে। বীরভাবে প্রায়ই পতন হয়।

গিরীশ—আমার এক সময় ঐ ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হয়ে গিরীশের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করলেন।

গিরীশ—ঐ আড়টুকু আছে। এখন উপায় কি বলুন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) —তাঁকে আমমোক্তারী দাও। তিনি যা হয় করুন। তাঁর চরণে সব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। কি জান ? রজোগুণ না গেলে, শুদ্ধ সত্ব গুণ না এলে ভগবানে মন স্থির হয় না, তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরীশ—আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই ! তবে বলেছি, আন্তরিক হলে হয়ে যাবে। ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'আনন্দময়ী' 'আনন্দময়ী' বলতে বলতে সমাধিস্থ হচ্ছেন। তিনি অনেকক্ষণ সমাধিমগ্ন রইলেন। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুখমণ্ডলে বিমলানন্দ ফুটে উঠেছে। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে বালক ভক্তদের খবর নিচ্ছেন। শ্রীম বাবুরামকে ডেকে আনলেন। ঠাকুর বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের দিকে চেয়ে প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন. 'সচ্চিদানন্দই ভাল, আর কারণানন্দ।' এই বলে তিনি নিম্নোক্ত রামপ্রসাদী সঙ্গীত ভাবোন্মত্ত হয়ে গাইলেন।—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
সে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রঙ চড়ায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে লব অক্ষ ছুটী করে কুচি ॥
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
(আমি) কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটী মাতৃ-সঙ্গীত পূর্ববৎ গাইলেন।—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
কালী নামের কত গুণ কেবা জানতে পারে তায়
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমু'খ গুণ গায় ॥
দানব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, 'মা আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

গিরীশের শান্ত ভাব দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে বলছেন, "তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।" ঠাকুর রঙ্গালয়ে ম্যানেজারের কক্ষে উপবিষ্ট। একজন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি 'বিবাহ-বিভ্রাট' দেখবেন কি? উহার অভিনয় আরম্ভ হয়েছে।" এই কথা শুনে গিরীশকে ঠাকুর বলছেন, "একি করলে? 'প্রহ্লাদ চরিত্রে'র পর 'বিবাহ-বিভ্রাট'? আগে পায়েস মুণ্ডী দিয়ে পরে সুক্তানি!"

অভিনয় শেষ হলে গিরীশের নির্দেশে নটীগণ ঠাকুরকে নমস্কার

করতে এলেন। তাঁরা সকলে ঠাকুরকে নমস্কার করলেন; তন্মধ্যে কেউ কেউ ঠাকুরের পদধূলি লইলেন। তাঁরা যখন ঠাকুরের পাদ স্পর্শ করছিলেন, ঠাকুর করুণ কণ্ঠে বলছেন, 'মা থাক থাক। মা, থাক থাক।' তাঁরা প্রণাম করে চলে যাবার পর তিনি গিরীশাদি ভক্তবৃন্দকে বললেন, "সবই তিনি, এক এক রূপে।" এবার ঠাকুর ঘোড়া-গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন। গিরীশ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। গাড়ীতে উঠতে না উঠতেই ঠাকুর গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। নারায়ণাদি কয়েকটী ভক্ত গাড়ীতে গেলেন। গাড়ী ঠাকুরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলতে লাগল।

ইংবাজী ১১ই মার্চ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুধব'র শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বাহ্নে বাগবাজার পল্লীর শ্রীবলরাম বসুর বাটীতে এসেছেন। নরেন্দ্র, গিরীশ, বলরাম, চুনীলাল, মাস্টার, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট। শ্রীম'র সহিত একটু কথা বলবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার করে দেখো; সে কি বলে।"

গিরীশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র বলে ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি শুনি—বস্তু কিংবা ব্যক্তি—সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। অনন্ত আকাশের আবার অংশ কি? আকাশবৎ ঈশ্বরেব অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড় হউন তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটা উপমা দিয়ে বুঝান যায় না; এটি অনুভব করা চাই, প্রত্যক্ষ করা চাই। উপমা দ্বারা আংশিক

আভাস দেওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোওয়া যায়, তবে গরুকেই ছোঁওয়া হয়। তার পা বা লেজ ছুঁলেও গরুকে ছোঁওয়া হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার বস্তুই দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। সেইরূপ জীবকে প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর নরদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

গিরীশ—নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ভাব ধারণা করা যায়? তিনি অনন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের ধারণা পুরো ভাবে কে করতে পারে? তাঁর বড় ভাবটা ধারণা করা তো দূরের কথা, তাঁর ছোট ভাবটা ও ধারণা করতে পারা যায় না। আর তাঁর সব ভাবটা ধারণা করার কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখলে তাঁকেই দেখা হল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলুম। তজ্জন্য তাকে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সব গঙ্গা হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পা যদি ছুঁই, তোমাকেই ছোঁওয়া হল। যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কর তাহলে সাগর স্পর্শ করাই হয়। ঈশ্বর ও অবতার অভিন্ন। জীশু খ্রীষ্ট তাই বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা এক। অগ্নি সব বস্তুতে আছে; কিন্তু কাঠে বেশী। সর্ব জীবে ঈশ্বর থাকলেও অবতারে তাঁর প্রকাশ সব চেয়ে বেশী।

গিরীশ (সহাস্যে)—যেখানে আগুন পাব সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাসতে)—অগ্নি কাঠেই বেশী। যদি ঈশ্বর খুঁজতে চাও মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি অধিক প্রকট হন। যে

মানুষের দেখবে উর্জিতা ভক্তি, প্রেমা ভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা; নিশ্চিত জেনো, সেই মানুষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

গিরীশ—নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙমনসগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। তিনি এই মনের গোচর নন বটে; কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। তিনি এই বুদ্ধির গোচর নন; কিন্তু শুদ্ধা বুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন এবং শুদ্ধা বুদ্ধি হয়। শুদ্ধ মন এবং শুদ্ধা বুদ্ধি এক। ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্য দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরীশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না।' আমায় বলেছে, 'গিরীশ ঘোষের অত বিশ্বাস, মানুষকে অবতার বলে। এখন আমি আর কি বলব? অমন বিশ্বাসের ওপর আর কিছু বলতে নাই।'

গিরীশ (সহাস্যে)—মহাশয়, আমরা সব হলহল করে কথা বলছি; কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। ও চুপ করে কি ভাবে? মহাশয়, কি বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—

মুখহল্সা ভেতর বুঁদে কানতুলসে দীঘল ঘোমটা নারী।

পানাপুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥ (সকলের হাস্য)।

কিন্তু ইনি তা নন, ইনি গম্ভীরাত্মা।

গিরীশ—মহাশয়, শ্লোকটি কি বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই কয়টি লোকের কাছে সাবধান হবে প্রথম।

মুখহলসা, যে হল্ হল্ করে কথা কয়। তারপর ভেতরবুঁদে, মনের ভিতর ডুবুরী নামালেও যার অন্ত পাবে না। তারপর কানতুলসে, কানে তুলসী দেয় ভক্তি দেখাবার জন্য। দীঘল-ঘোমটা নারী, যে নারী লম্বা ঘোমটা দেয়। লোকে মনে করে, সে ভারি সতী। কিন্তু তা নয়। আর পানা পুকুরের জল, নাইলে সান্নিপাতিক জ্বর হয়।

কোন ভক্ত গিরীশ ঘোষ রচিত নিম্নোদ্ধৃত কৃষ্ণকীর্তন গাহিলেন।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী॥
হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার॥
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন।
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখি পাখা রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
গোবর্ধনধারণ বনকুসুমভূষণ দামোদর কংসদর্পহারী
শ্যামরাসরসবিহারী॥
হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—আহা! বেশ গানটি! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

গায়ক ভক্ত—হাঁ, উনিই 'চৈতন্যলীলা'র সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—এই গানটি খুব উতরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে উল্লিখিত গায়ক আর দুইটি গান গাইলেন। ভক্তগণ শ্রীমকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনি একটু লাজুক বলে অস্পষ্ট স্বরে অক্ষমতা জানালেন।

গিরীশ (সহাস্যে ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, মাস্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)—ও স্কুলে দাঁত বার করবে ; এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা !

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে শ্রীম মুখটি চুন করে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে গিরীশ ঘোষকে দেখিয়ে হাসিমুখে কথা কইতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তো কি ? গিরীশ তোমার চেয়ে !

সুরেশ মিত্র (সহাস্যে)—আজ্ঞে হাঁ, ইনি আমার বড় দাদা। (সকলের হাস্য)।

গিরীশ (ঠাকুরের প্রতি)—আচ্ছা মহাশয়, আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নি ; তবু লোকে আমাকে বিদ্বান বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মহিমা চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র টাস্ত্র দেখেছে, শুনেছি ! খুব আধার। (মাস্টারের প্রতি) কেমন গা ?

মাস্টার—আজ্ঞা হাঁ।

গিরীশ ঘোষ—কি বিদ্যা ? ও অনেক দেখেছি, ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার ভাব কি জান ? বই শাস্ত্র কেবল ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ উপায় জেনে নেবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার ? তখন সাধন-সাগরে ডুব দিতে হয়। ভাগবতে আছে, ধান্যার্থী পলাল ফেলে দিয়ে যেমন ধান্য সংগ্রহ করে তেমনি ভক্ত শাস্ত্র পড়ে সাধনে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায় লেখা আছে। কিন্তু উপায় জেনে সাধন আরম্ভ করতে হয়। তবে ত বস্তুলাভ, ঈশ্বরদর্শন হয়।

শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের

জানা থাকতে পারে ; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা আছে তার শাস্ত্র-বাক্যে ধারণা হয় না। তার শাস্ত্র-পড়া মিছে। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল ; কিন্তু পাঁজি নিংগড়ালে এক ফোঁটাও জল পড়ে না।

গিরীশ (সহাস্যে)—মহাশয়, পাজি নিংগড়ালে এক ফোঁটাও জল পড়ে না ? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—পণ্ডিত খুব বড় কথা বলে ; কিন্তু তার নজর থাকে কোথায় জান ? কামিনী আর কাঞ্চনে—দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে ; কিন্তু নজর রাখে ভাগাড়ে। সে কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জন্তু, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশের নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করলেন এবং শ্রীমকে বললেন, 'দেখ, গিরীশের খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।' যদিও গিরীশ অল্পকাল মাত্র আসছেন, তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব-পরিচিতবৎ, এমন কি পরমাত্মীয়বৎ তাঁকে দেখছেন। নারায়ণের প্রার্থনায় ঠাকুর তিনটা গান গাইলেন। সন্ধ্যা সমাগত। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তনান্তে প্রার্থনা করছেন, "মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহ-সুখ চাই না, মা। লোকমান্য চাই না, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি হয়, আর যেন মা তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা ! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। কৃপা করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

সেই রাত্রে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য গিরীশ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত হবে না? গিরীশ উত্তর দিলেন, "না। যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন। আমায় আজ থিয়েটারে যেতে হবে, তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।" রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ঠাকুর ঘোড়া-গাড়ীতে চড়ে গিরীশের বাড়ীতে যাবার জন্য রওনা হলেন। পথে বলরামের বাড়ীতে নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ঠাকুর যখন গিরীশের গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন তখন গিরীশ তাঁকে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন এবং তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন। ঠাকুর গিরীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। সেখানে একখানা খবর কাগজ পড়েছিল। খবর কাগজে বিষয়-কথা, পরচর্চা থাকে বলে ঠাকুর তা ছুঁতে পারতেন না। তাই সেটি স্থানান্তরে নেবার জন্য তিনি ইসারা করলেন। কাগজখানা সরাবার পর তিনি আসনে উপবিষ্ট হলেন। ঠাকুর গিরীশকে বলছেন, "তুমি ও নরেন দুজনে ইংরাজীতে একটু বিচার কর, আমি দেখব।" ঠাকুরের আদেশে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হল। বাংলাতে বিচার হলেও মাঝে মাঝে দুটি একটি ইংরাজী কথা ছিল। ক্রমে সামান্য বিচার ঘোর তর্কে পরিণত হল। হ্যামিলটন, হার্বর্ট স্পেন্সার, টিণ্ডাল ও হাক্সলে প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করে নরেন্দ্রনাথ তর্ক করলেন। তর্ক শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বললেন, "বিচার আর কি করব? দেখছি তিনিই সব।" তিনি গিরীশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়। তার কি করলে বল দেখি?" গিরীশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, ঐটে ছাড়া আর সব বুঝেছি কিনা! (সকলের হাস্য)।

একটু পরে গিরীশ থিয়েটারে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন

এবং ঠাকুরকে বললেন, "আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—হঁা, ইদিক্ উদিক্ দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজা 'ইদিক্ ওদিক্ দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' (সকলের হাস্য)।

গিরীশ—থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদের হাতে ছেড়ে দেব মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, ও বেশ আছে; ওতে অনেকের উপকার হচ্ছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল ঠাকুর কলিকাতায় নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় এসেছেন। তথায় শ্রীম, গিরীশ, বাবুরাম, পূর্ণ, ছোট নরেন, পল্টু প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়াতে এসে বললেন, "দেবেন্দ্র, আমার জন্য খাবার বিশেষ কিছু কোরো না, অমনি সামান্য, শরীর তত ভাল নয়।" গিরীশ ঘোষও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে তিনটি গান গাইলেন। গান শুনে গিরীশ ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গিরীশকে নমস্কার করলেন।

ইংরাজি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী। গিরীশ, শ্রীম, গোপালের মা, বলরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ এসেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট। গিরীশ ঘোষ দুই একটি ভক্ত সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তিনি কিছু মদ খেয়েছেন এবং ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়ে কাঁদছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁর পিঠ চাপড়াতে লাগলেন এবং একজন ভক্তকে ডেকে বললেন, "ওরে একে তামাক খাওয়া।" গিরীশ মাথা তুলে হাত জোড় করে ঠাকুরকে মর্ম-ব্যথা জানাচ্ছেন।

গিরীশ—তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম! তা যদি না হয় সবই মিথ্যা! বড়

খেদ রইল, তোমার সেবা করতে পেলুম না। দাও বর ভগবন্, এক বৎসর তোমার সেবা করবো। মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব করে দেই। বল, এক বৎসর সেবা করব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভাল নয়, কেউ কিছু বলবে।

গিরীশ—তা হবে না, বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে যখন যাব তখন বলবো।

গিরীশ—না তা নয়, এইখানে বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা !

গিরীশ—বল, তোমার গলার অসুখ সেরে যাবে। আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেব, কালী ! কালী !

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার লাগবে।

গিরীশ—ভাল হয়ে যা ! ফুঁ ! ভাল যদি না হয়ে থাকে ত যদি আমার ওপদে কিছু ভক্তি থাকে তবে অবশ্য ভাল হবে। বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যা বাপু, আমি ওসব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বলতে পারি না। আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরীশ—আমায় ভুলান ! তোমার ইচ্ছায় হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছিঃ ! ওকথা বলতে নাই। 'ভক্তবৎ, ন চ কৃষ্ণবৎ।' তুমি যা ভাব তুমি ভাবতে পার। নিজের গুরু তো ভগবান। তা বলে ওসব কথা বলায় অপরাধ হয়, ও কথা বলতে নাই।

গিরীশ—বল, ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরীশ—হাঁগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন? এবার বুঝি, বাংলা উদ্ধার! (ভক্তবৃন্দকে) ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝ্‌ছ? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন, তাদের উদ্ধার করবার জন্য।

গাড়োয়ান ডাকছিল বলে গিরীশ উঠে তার কাছে যাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীমও তাঁর সঙ্গে গেলেন। গিরীশ আবার ফিরে এসে ঠাকুরকে স্তব করছেন।

গিরীশ—ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও, যাতে কখনো একটু পাপচিন্তা না' আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তো পবিত্র আছো। তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি! তুমি তো খুব আনন্দে আছ।

গিরীশ—আজ্ঞে না। মন খারাপ, বড় অশান্তি। তাই খুব মদ খেলুম। ভগবন্, আশ্চর্য হচ্ছি যে, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি। এমন কি তপস্যা করেছি যে, এই সেবার অধিকার পেয়েছি!

ঠাকুর মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে একটু বিশ্রাম করলেন। তিনি সর্বদাই ভাবাবিষ্ট, জোর করে মনকে শরীরের দিকে টেনে আনেন। বিশ্রামের পর ভক্তগণ তাঁর ঘরে এসে বসলেন। তখন গিরীশের সঙ্গে আবার তাঁর ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল।

গিরীশ—হাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট; গুরুরূপ বেশ লাগে। ভয় হয় না, কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই, ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ইষ্ট তিনি গুরুরূপ ধরে আসেন। সব সাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয় গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন, "এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট)।" এই কথা বলেই তিনি ইষ্টরূপে লীন হয়ে যান।

শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য! 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

নবগোপাল প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে গিরীশের একটু কথা হল। অতঃপর অন্য প্রসঙ্গ উঠল। ঠাকুর অন্য ভক্তদের সঙ্গে কথা কইলেন। সন ১২৯১ সাল ১২ই ফাল্গুন (২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) রবিবার শুক্লাষ্টমী। গত সোমবার ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ৫০তম জন্মতিথি গিয়েছে। আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমবেত। প্রাতঃকাল হতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় কীর্তন চলছে। ঠাকুর তথায় বসে ভক্ত সঙ্গে কীর্তন শুনছেন। কীর্তন শুনতে শুনতে তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি আবার বসলেন। কীর্তনান্তে গিরীশাদি ভক্তদের সহিত নিজের ঘরে গেলেন। গিরীশের বিশ্বাস, ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

গিরীশ—আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার সঙ্গে ঢং করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। এদিকে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

গিরীশ—বুঝেছি। আপনাকে এখন বুঝ্‌ছি।

বেলা ১১টার সময় ঠাকুর ভক্তদের অনুরোধে নূতন কাপড় পরলেন ও খেতে বসলেন। তিনি নরেন্দ্রের গান শুনে ভাবাবেশে খাচ্ছিলেন ছুই

হাতে। পরে তাঁর নির্দেশে ভবনাথ তাঁকে খাইয়ে দিলেন। সমবেত ভক্তগণও চিঁড়ে ও মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পেলেন। ঠাকুর আজ সদানন্দ। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সহাস্যে বললেন, "গিরীশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর। তাহলে থিয়েটার দেখতে পাবি।" ঠাকুরের ঘরে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ মেঝের উপর বসে আছেন। গিরীশও এসে তাঁদের সঙ্গে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।

গিরীশ—আপনি কারই বা অনুগত নন!

এই কথার পর গিরীশ বাহিরে তামাক খেতে গেলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—গিরীশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড় লোক। আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সত্যি বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি? গীতা গীতা দশ বার বললে যা হয়; ত্যাগী ত্যাগী। শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়, তারপর সাধন ভজন।

এইবার গিরীশ ঘরে এলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—আমার কথা তোমরা সব কি কচ্ছিলে? আমি খাই দাই থাকি।

গিরীশ—আপনার কথা আর কি বলবো, আপনি কি সাধু!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি সাধুটাধু নয়, সত্যই তো আমার সাধু বোধ নাই।

গিরীশ—ফচ্‌কিমিতেও আপনার সঙ্গে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি লাল পেড়ে কাপড় পরে জয় গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব আমার লাল পেড়ে কাপড দেখে বললে, আজ বড় যে রং, লাল পাড়ের বাহার! আমি বললুম, কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।

সন্ধ্যা নেমে এল। কালী মন্দিরে ও বিষ্ণু মন্দিরে ও শিব মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। শুক্লাষ্টমার চন্দ্রালোকে কালীবাড়ী, ভাগীরথী ও চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে স্বায় কক্ষে বসে জগন্মাতার চিন্তা করছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চলে গেছেন। সান্ধ্য আরতি সমাপ্ত হলে ঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব লম্বা বারান্দায় এসে ভাবাবেশে পাদচারণ করতে লাগলেন। শ্রীম সেখানে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দর্শন করছেন। এমন সময় গিরীশ ঘোষ এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি গাইতেছেন।—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপ দিগম্বরী হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥

ঠাকুর মাতোয়ারা হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় গিরীশের গায়ে হাত দিয়ে আর এই গান ধরলেন।—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥

জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চ মুখে গুণ গায়॥

ঠাকুর আরো একটি গান গাইলেন। গিরীশকে দেখতে দেখতে যেন তাঁর ভাবোল্লাস বেড়ে উঠল। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় আবার এই গান গাইলেন।—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
আমি কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এই দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যেজন তার ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

ভাবোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর গিরীশাদি ভক্তগণকে বললেন, 'ভাবেতে ভরল তনু হারাল গেয়ান।' সে 'জ্ঞান' মানে বাহ্য জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান এসব চাই। ভক্তিই সার। সকাম ভক্তি আছে; আবার নিষ্কাম ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তিও আছে। আবার আছে ঊর্জিতা ভক্তি—ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। যেমন চৈতন্যদেবের। 'ভাবে হাসে নাচে গায়।' অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি সেখানে জানবে, আমি স্বয়ং বর্তমান। সেরূপ শ্রদ্ধালু ভক্তের হৃদয়ে আমি অহর্নিশ দৃশ্য হই।

গিরীশ—আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ওষুধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল হল, কে বলবে? লক্ষ্মণ লব-কুশকে বললেন, তোরা ছেলে মানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস্ না। তার পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লব-কুশ বললে, ঠাকুর সব শুনেছি। পাষাণী মানবী হল সে মুনি-বাক্য ছিল বলে। গৌতম মুনি বলেছিলেন, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন। তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে, না মুনিবাক্যে—কে বলবে বল? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয় আমাকে হেতু মাত্র জানবে। চাঁদ মামা সকলের মামা।

গিরীশ (সহাস্যে)—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো? আমিও তো তাই বলছি। আপনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাস থাকলে, সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়। যার মন বাঁকা, সরল নয়; যার শুচি বাই আছে এবং যে সংশয়াত্মা, এদের ভক্তি বা জ্ঞান হয় না।

সন ১২৯১ সাল ১৫ই ফাল্গুন (২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) বুধবার শুক্লা একাদশী। আজ ঠাকুর থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখতে যাবেন। সেজন্য বৈকালে বাগবাজার পল্লীতে বসুপাড়া লেনে গিরীশ ঘোষের বাড়ীতে এসেছেন। শ্রীম প্রভৃতি ভক্তগণও

সমবেত হলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদি ভক্তদের প্রতি)—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবের এই তিন অবস্থা। যারা ব্রহ্ম বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে, ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন দেহের পার; সত্ত্ব, রজঃ ও তম তিন গুণের পার। এই সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরো বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলে দুটো দেখায়, দ্বৈতাভাস হয়, প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। দেহ-বুদ্ধি চলে গেলে 'সোঽহং', 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই চরম অনুভূতি হয়।

তাকে পাবার দুই পথ—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সে তাও পায়। দুই পথ দিয়েই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতারাদি।

দেহাত্ম-বুদ্ধি, 'আমি' বুদ্ধি কিন্তু সহজে যায় না। তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হয়ে যায়। নির্বিকল্প সমাধিতে, জড় সমাধিতে 'আমি' মুছে যায়। সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে। সে বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি'। এই বিদ্যার 'আমি' দিয়ে লোক শিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকতেন, ঈশ্বরীয় কথা কইতেন, নাম-সংকীর্তন করতেন।

'আমি' তো সহজে যায় না। তাই ভক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন প্রভৃতি

অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই নেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন গুণও নেয়। ভক্ত দেখে, তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন। আবার সে জানে, সাকার চিন্ময় রূপে তিনি দর্শন দেন।

ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধুসঙ্গ, তীর্থদর্শন, জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে, যদি 'আমি' সহজে চলে না যায় তবে থাক্ শালা দাস হয়ে, ভক্ত হয়ে।

ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। জগৎকে সে স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলে না। তবে বলে, তিনি এই সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ। তবে পাকা ভক্তি হলে ঐরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে। তখন দেখে যে, সবই হলদে। শ্রীমতী (রাধা) শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভবে ভেবে আরসুলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, সে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়, আবার দেখে, তিনিই আমি, আমিই তিনি। আরসুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায় তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।

যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, সখ্য—এই সব ভাব। আমি দাসী ভাবে এক বৎসর ছিলাম, ব্রহ্মময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম; আবার নথ পরতাম। মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।

সেই আদ্যা শক্তির পূজা করতে হয়, তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়, তাতে পতন হয়। ভোগ থাকলেই ভয়। মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী। এতে কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে, ফলমূল খেয়ে একাদশী। আর লুচিছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জলা একাদশী। আমি মাতৃভাবে ষোড়শী পূজা করেছিলাম। দেখলাম, নারীস্তন মাতৃস্তন, নারীযোনি মাতৃযোনি। এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এই শেষ কথা।

সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে তাহলেই ভয়। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ। যেমন থুতু ফেলে আবার থুতু খাওয়া। টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ—এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর পক্ষে ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়। নিজেরও ক্ষতি, আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক শিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোকশিক্ষার জন্য।

মেয়েদের সঙ্গে বসা, কি বেশী ক্ষণ আলাপ, তাকেও শাস্ত্রে রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার।* মেয়েদের কথা শুনছি, শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে। ও এক রকম রমণ।[১] মেয়েদের কথা বলছি—ও এক রকম রমণ। মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি। ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে। ও এক রকম রমণ। স্পর্শ করা এক রকম রমণ। তাই

* শ্রবণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও যৌনক্রিয়া।

১ মৈথুন

গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই। সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম পালন করতে হয় সর্বতো ভাবে।

সন্ন্যাসীদের আলাদা কথা। দুই একটি ছেলে হলে গৃহী ভক্ত পত্নীর সঙ্গে ভাই-ভগিনীর মত থাকবে। তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই। গৃহস্থের ঋণ আছে—দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ। আবার মাগ-ঋণও আছে; একটী দুটী ছেলে হওয়া, আর সতী হলে প্রতিপালন করা। সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী, কে বিদ্যা শক্তি, কে অবিদ্যা শক্তি। যে ভাল স্ত্রী, বিদ্যা শক্তি তার কাম ক্রোধ এসব কম। তার ঘুমও কম, স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ দয়া ভক্তি লজ্জা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্য ভাবে। আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে। সে বেশী খরচ করে না। পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর-চিন্তার অবসর কম হয়। আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ ট্যারা, চোখ কোটর; আর উঁণ পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।

গিরীশ—আমাদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজ, ভক্তির তম আছে। ভক্তির সত্ত্ব দীন হীন ভাব। যেমন দুর্গাচরণ নাগের ভক্তির তম যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি? তিনি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।

গিরীশ (সহাস্যে)—ভক্তির তম আপনিই তো শেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে দর্শন করার কিন্তু লক্ষণ আছে। তখন সমাধি

হয়। সমাধি পাঁচ প্রকার—প্রথম পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। দ্বিতীয় মীনের গতি। তৃতীয় তীর্যক্ গতি। চতুর্থ পাখীর গতি; পাখী যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায়। পঞ্চম কপিবৎ, বানরের গতি। মহাবায়ু যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল, আর গভীর সমাধি হল। আবার দুই রকম সমাধি আছে। প্রথম স্থিত সমাধি, জড় সমাধি। একেবারে বাহ্য শূন্য, অনেক ক্ষণ, হয়ত অনেক দিন সমাধিস্থ রইল। দ্বিতীয় উন্মনা সমাধি: হঠাৎ মনটা চার দিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।

গিরীশ—তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা রকমে লোকে তাঁকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা সাধন-ভজন করে। সে সাধন-সিদ্ধ। কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ; যেমন নারদ শুকদেবাদি। এদের বলে নিত্যসিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ; হঠাৎ ঈশ্বর-লাভ করেছে। যেমন কোন আশা ছিল না, হঠাৎ কেউ নন্দ বসুর মত বিষয় পেয়ে গেল। আবার আছে স্বপ্নসিদ্ধ, আর কৃপাসিদ্ধ।

এই কথা বলে ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে এই গানটি গাইলেন।—

> শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
> শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥ *

ঠাকুর খানিকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হয়ে রইলেন। গিরীশাদি ভক্তবৃন্দ তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট। কিছুদিন পূর্বে গিরীশ ষ্টার থিয়েটারে ঠাকুরকে গালমন্দ করেছিলেন। এখন তাঁর শান্ত ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—তোমার এই ভাব বেশ ভাল।

---

* এই গানের বাকী অংশের জন্য এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখুন।

এখন তোমার শান্ত ভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা একে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরীশ (মাষ্টারের প্রতি)—আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে, আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও অন্তর্মুখ, ভাবাবিষ্ট। নারায়ণ, তেজচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে দুই একটি করে কথা বললেন। কাছে এক গ্লাস জল ছিল, তা পান করলেন। গিরীশের ভ্রাতা অতুল হাইকোর্টের উকিল। তাঁকে সাধন ভজন সম্বন্ধে তিনি কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি সন্ধ্যা সমাগমে হরিনাম করলেন। আবার গিরীশকে ব্যস্ত দেখে তিনি চুপ করলেন। বীডন ষ্ট্রীটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার হয় সেখানে পূর্বে স্টার থিয়েটার হত। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর স্টার থিয়েটারে গিয়ে দক্ষিণাস্য হয়ে বক্সে বসলেন। নরেন্দ্র, মাষ্টারাদি ভক্তগণ তাঁর কাছেই বসেছেন।

বৃষকেতু অভিনয় হচ্ছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী দুইজন দুই দিকে করাত দিয়ে পুত্র বৃষকেতুকে বলিদান করলেন। পদ্মাবতী কাঁদতে কাঁদতে পুত্র-মাংস রাঁধলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি সানন্দে কর্ণকে বলছেন, "এখন এস, আমরা এক সঙ্গে বসে রান্না-করা মাংস খাই।" কর্ণ করযোড়ে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি পুত্রের মাংস খেতে পারবো না।" অভিনয় দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখ প্রকাশ করলেন। অভিনয় সমাপ্ত হলে ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রামাগারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিরীশ, নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন। এখনও থিয়েটারের ঐক্যতান বাদ্যধ্বনি শুনা যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদি ভক্তদের প্রতি)—এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে* সানাই বাজত, আর আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতাম। একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলেছিল, এসব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

ঐক্যতান বাদ্য (কনসার্ট) থেমে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—একি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের ?

গিরীশ—আজ্ঞা, আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের কথাটীই ভাল ; আমার বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে, আমি নিজে এসেছি। এসব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকে বলে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে একটু কথা বললেন। তাঁর অনুরোধে নরেন্দ্র একটী গান গাইলেন। গান শেষ হলে তিনি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

গিরীশ—দেবেন্দ্র বাবু আসেন নি। তিনি অভিমান করে বলেন, আমাদের ভিতর ত ক্ষীরের পুর নাই, কলাইয়ের পুর। আমরা গিয়ে কি করবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিস্মিত হয়ে)—কই আগে ত উনি ওরকম করতেন না।

ঠাকুর জলপান করলেন এবং নরেন্দ্রকেও খেতে দিলেন। তিনি 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় দেখবেন বলে বক্সে গিয়ে বসলেন। অভিনয়ে ঝির কথাবার্তা শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি কিছুক্ষণ অভিনয়

---

* দক্ষিণেশ্বরে

শুনে অন্যমনস্ক হলেন এবং শ্রীম'র সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। এবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। তিনি কোন ভক্তের নিকট গিরীশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "রসুন-গোলা বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়?" এই কথা শুনে গিরীশ একটু অভিমান করেছেন এবং ঠাকুরকে অন্তরের আর্তি জানাচ্ছেন।

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—রসুনের গন্ধ কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, যাবে।

গিরীশ—তবে বল্লেন, যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অত আগুন জ্বললে গন্ধ ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন বাটি হয়ে যায়। যে বলে, আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে, আমি মুক্ত হয়েছি সে মুক্তই হয়। সে রাতদিন বলে, আমি বদ্ধ, আমি বদ্ধ সে বদ্ধই হয়ে যায়।

সন ১২৯৩ সাল, ৪ঠা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার। কাশীপুর বাগানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগ চিকিৎসার্থ রয়েছেন। গিরীশ, শ্রীম, শশী, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এসেছেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে এসে ভূমিষ্ট হয়ে তাকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর সামনে মেঝের উপর বসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীম একটি আলো তাঁর কাছে রাখলেন। ঠাকুর স্বীয় শয্যায় বসে গিরীশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) এঁকে তামাক খাওয়া আর পান এনে দে। (একটু পরে) কিছু জল খাবার এনে দে।

লাটু গিরীশকে পান-তামাক দিলেন এবং তাঁর জন্য জলখাবার আনতে বরাহনগরে ফাগুর দোকানে লোক পাঠালেন। কোন ভক্ত কয়টি ফুলের মালা এনেছেন। ঠাকুর নিজ গলায় একে একে সেগুলি পরলেন। তারপর দুইগাছি মালা নিজের গলা থেকে নিয়ে গিরীশকে দিলেন। গিরীশের জন্য জলখাবার এল কি না, সেই কথা মাঝে মাঝে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন। কোন ভক্তের একটি বালক সন্তানের মৃত্যুর কথা উঠল। ভক্তটি মৃত পুত্রের জন্য শোক করেছিলেন। সেই কথা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত ও নির্বাক রইলেন।

গিরীশ—অর্জুন অত গীতা-টীতা পড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত! তা এঁর ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চর্য নয়।

গিরীশের জন্য গরম কচুরি, লুচি ও মিষ্টান্ন এল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেই জলখাবার সামনে রেখে প্রসাদ করে দিলেন। তারপর নিজে হাতে নিয়ে সেই খাবার গিরীশকে দিলেন এবং বললেন, 'বেশ কচুরি।' ভক্তবীর গিরীশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে জলখাবার খেতে লাগলেন। ঠাকুর এত দুর্বল হয়েছিলেন যে, তাঁর দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিল না। তাঁর শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল ছিল। বৈশাখ মাসে কুঁজোর জল বেশ তৃপ্তিকর। ঠাকুর শিশুবৎ দিগম্বর হয়ে স্বীয় শয্যা থেকে এগিয়ে গিয়ে নিজে কুঁজো থেকে জল গড়ালেন। তিনি গেলাস থেকে একটু জল নিজ হাতে নিয়ে দেখলেন, জল তত ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু অন্য ভাল জল পাবার সম্ভাবনা না থাকায় সেই জলই গিরীশকে তিনি খেতে দিলেন। শ্রীম চন্দন কাঠের পাখা নিয়ে

ঠাকুরকে বাতাস করছেন। গিরীশ খেতে খেতে ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন।

গিরীশ—দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ করবেন।

কথা বলতে ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার পরিবারদের খাওয়া পরা কিরূপে চলবে ?'

গিরীশ—তা তিনি কি করবেন জানি না। আচ্ছা মহাশয়, কোন্‌টা ঠিক ? কষ্টে সংসার ছাড়া, না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতায় দেখনি ? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়। যারা কষ্টে পড়ে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান ? যেন সার্সীর ঘরে কেউ আছে ; ভিতর-বাহির দুইই দেখতে পায়।

গিরীশ জলখাবার খেতে খেতে বললেন, 'বেশ কচুরি।'

শ্রীম—ফাগুর দোকানের কচুরি বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিখ্যাত! তবে লুচি যাক, কচুরি খাও। কচুরি কিন্তু রজোগুণীর খাদ্য।

গিরীশ—আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নীচু হয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু, কখনো নীচু। কখনো বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই এরূপ হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরি নাম করে ; কখন বা সে কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো বা সন্দেশে বসে, কখনো

পচা ঘাতে বা বিষ্ঠাতে বসে। ত্যাগীদের কথা আলাদা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর ছাড়া তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়-কথা হলে উঠে যায়, ঈশ্বরের কথা হলে শোনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আনে না। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে, মধু খাবে বলে। অন্য কোন জিনিষ মৌমাছির ভাল লাগে না।

গিরীশ খাবার খেয়ে দক্ষিণ দিকের ছোট ছাদের উপব হাত ধুতে গেলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বললেন, 'গিরীশ অনেকগুলো কচুরি খেলে; ওকে বলে এস, আজ আর কিছু না খায়।' একটু পরে গিরীশ মুখ ধুয়ে ঠাকুরের ঘরে এলেন এবং তাঁর সম্মুখে বসে পান খেলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় গিবীশের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ—রাখাল- টাখাল এখন বুঝেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। তার পরিবারও আছে, ছেলেও হয়েছে, কিন্তু বুঝেছে যে, সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ, পাঁকের ভিতব থাকে; কিন্তু তার গায়ে পাঁকের দাগ লাগে না।

গিরীশ—মহাশয়, ওসব আমি বুঝি না। আপনি মনে করলে সববাইকে নির্লিপ্ত আর বিশুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী, কি ত্যাগী সকলকে আপনি ইচ্ছামাত্র ভাল করতে পারেন। আমি বলি, মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার না থাকলে কোন কাঠ চন্দন হয় না। শিমুল আর কয়টি গাছ চন্দন হয় না।

গিরীশ—তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে এরূপ আছে।

গিরীশ—আপনার সব বে-আইনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হতে পারে। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল হয়। যখন ভক্তি-উন্মাদ হয় তখন বেদবিধি মানে না। পূজার জন্য দূর্বা তোলে, তা বাছে না। যা হাতে আসে তাই লয়। তুলসী তোলে পড় পড় করে ডাল ভাঙে। আহা! তখন কি অবস্থাই গেছে! শুদ্ধা ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না। একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও সখ্য। কৃষ্ণাবতারেও ঐ সব ছিল; আবার মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব, ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব, ছেনালী নাই। তাঁরই লীলা। যখন যে ভাব। বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন ভাব প্রবর্তিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলী শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাতে যেত। সে কালীকীর্তন ও ব্রহ্মসঙ্গীত দুই-ই গাইত। সে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে আসত এবং ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য উপদ্রব করত। ভক্তগণ তাকে পাগলী ভেবে তাড়িয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশকে সেই পাগলীর কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথা ব্যথা করছে? (সকলের হাস্য)। আর একদিন গিছলো,

আমি তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ বল্‌লে, দয়া করলেন না? আমি উদার বুদ্ধিতে খাচ্ছি। হঠাৎ বলছে, মনে ঠেললেন কেন? জিজ্ঞাসা করলুম, তোর কি ভাব? সে বললে, মধুর ভাব। আমি বললাম, আরে, আমার যে মাতৃ-যোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়! তখন বললে, তা আমি জানি না। তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, ওরে রামলাল, মনে ঠ্যালাঠেলি কি বল্‌ছে, শোন দেখি?

গিরীশ—সে পাগলী ধন্য। পাগল হোক, আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, অষ্ট প্রহর তো সে আপনার চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না। আপনি ত নিজ মুখে অভয়-বাণী দিয়েছেন, আপনাকে চিন্তা করলেই সব হবে, আর কিছু করতে হবে না। মহাশয়, কি বলবো? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে যে আলস্য ছিল, সেই আলস্য এখন ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল; তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি। কি আর বল্‌বো! আপনি ত সবই জানেন।

সমবেত ভক্তবৃন্দ একমনে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত শ্রবণে আত্মহারা। নিরঞ্জন সেন উল্লিখিত পাগলী সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করায় রাখাল ঘোষ বিরক্ত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সব কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি গিরীশ ঘোষকে পূর্ববৎ উপদেশ দিতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকাকে গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে একদিন হয়ত সব টাকা বেরিয়ে যাবে। আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জান? যারা খুব যত্ন করে জমির চার দিকে আল দেয় তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা এক দিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে

তাদের কেমন পলি পড়ে, কেমন ধান হয়। যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুর-সেবা ও সাধু-ভক্তের সেবা করে এবং দান করে তাদেরই পুণ্য হয়, তাদেরই ফসল হয়। আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিষ খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে তাদের ধন যেন রক্ত-পূঁজ!

গিরীশ—রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন। কারুর কাছে একটী পয়সা নেয় না। তার দান-ধ্যান আছে।

আট

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা

এক

শ্যামপুকুরে

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে প্রকটিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ত্যাগ হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর তাঁহার অন্ত্যলীলা স্থায়ী হয়। জীবনের শেষ বর্ষে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত ও শয্যাগত ছিলেন। অথচ এই বৎসরই তাঁহার ভাগবত জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিকতর আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। তখন ভক্তবৃন্দ নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র অতিমানব নহেন; তিনি দেবমানব নারায়ণ, লীলানট পুরুষোত্তম। তাই স্বামী সারদানন্দ

বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ে সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।"

পানিহাটীর মহোৎসবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া এবং সিক্ত দেহে বহুক্ষণ ভাবাবেশে নৃত্যাদি করিয়া ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের গলায় ব্যথা বৃদ্ধি পাইল। তিনি গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে ছোট খাটটির উপর বসিয়া থাকিতেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্বেও ভক্তগণ আসিলে তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। এইরূপে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাধিক চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও তাঁহার গলার ব্যথা কমিল না। অন্য সময়ে ব্যথা স্বল্প অনুভূত হইলেও একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ কঠিন খাদ্য তিনি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না, দুধ-ভাত ও সুজির পায়স খাইয়া থাকিতেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষাপূর্বক স্থির করিলেন, ইহা ধর্মপ্রচারকদিগের গলরোগ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে তাঁহার নিকট লোক-সমাগম পূর্বাপেক্ষা অধিক হইত। ১৮৮৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে তিনি গলরোগে আক্রান্ত হইবার পরে লোক-সমাগম আরো বাড়িল। ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধি দর্শনে অন্তরঙ্গগণ বিষণ্ণ হইলেন। কারণ ঠাকুর নিজ মুখে বারবার বলিয়াছিলেন, "অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধাভক্তি করিবে তখনি ইহার (শরীরের) অন্তর্ধান হইবে।"

দেহরক্ষার কালনিরূপক অনেক ইঙ্গিত ঠাকুর ভক্তগণকে

দিয়াছিলেন। কণ্ঠরোগ হইবার চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি সহধর্মিণী সারদা দেবীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়াও অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব তখন জানিবে, দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" কণ্ঠরোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাচক্রে সেরূপ হইতেছিল। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অন্যসকল ভোজ্য দ্রব্য যাহার তাহার হাতে খাইতেছিলেন। কলিকাতায় আগমন করিলে তাঁহাকে কখন কখন স্বীয় ভক্ত বলরাম বসুর বাটীতে রাত্রি-বাসও করিতে হইত। এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ অজীর্ণ রোগে ভুগিতে-ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া তিনি বহু দিন আসিতে পারেন নাই। ঠাকুর এক দিবস তাঁহাকে প্রাতে আনাইয়া নিজের জন্য প্রস্তুত ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বাকী অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সারদা দেবী আপত্তি করিয়া পুনরায় রন্ধনের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নিষেধপূর্বক বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ দিতে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।"

বালকের ন্যায় ঠাকুর তাঁহার গলা-ব্যথার কথা সকলকে বলিতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ শ্রাবণের শেষে কোন রমণী ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব হইতেই ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন সাধকের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছিলেন। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইবার মন্ত্র জানিতেন। অবশ্য এই কথা

ঠাকুরের নিকট তিনি কখনো প্রকাশ করেন নাই। একদিন তিনি সমীপে আসিতে অন্তর্দর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে। তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।" ঠাকুর কিরূপে ইহা জানিতে পারিলেন, এই ভাবিয়া রমণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি মন্ত্র পড়িয়া তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিলেন। শ্রাবণ অতীত হইয়া ক্রমে ভাদ্র আগত হইল। কিন্তু ঠাকুরের গলার ব্যথার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভাদ্র মাসে এক সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের কণ্ঠতালু হইতে রুধির নির্গত হইল। তখন প্রবীণ ভক্তগণ ঠাকুরকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া চিকিৎসার সঙ্কল্প করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেইজন্য বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রিটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করা হইল।

কিন্তু গঙ্গাতীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে ঠাকুর অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি উক্ত ক্ষুদ্র গৃহে ঢুকিয়াই তথায় থাকিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর স্ট্রিটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া গেলেন এবং তথায় এক সপ্তাহ রহিলেন। ভক্তগণ গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরাজগণকে আনাইয়া ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা করাইলেন। কবিরাজগণ পরীক্ষান্তে স্থির করিলেন, ঠাকুরের গলদেশে রোহিনী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে। যাইবার সময় একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কোন ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে রোহিনী রোগ তাহাই। ইহার আরোগ্যের সম্ভাবনা

কম।” কবিরাজগণের নিকট বিশেষ আশা না পাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে ঠাকুরকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অধীনে রাখা হইল। যে সাত দিন ঠাকুর বলরাম-ভবনে ছিলেন প্রত্যহ তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত। সকাল হইতে ভোজনকাল পর্যন্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার পর্যন্ত বহু লোকের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবৎপ্রসঙ্গ করতেন। যেন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার জন্য, সর্বসাধারণকে ধর্মালোক প্রদানের উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন, চিকিৎসার্থ নহে। বলরাম ভবনের দ্বিতলের লম্বা ঘরখানি নিত্য নরনারীতে পূর্ণ হইত। একদিন পূর্ণ, শরৎ, গিরীশ চন্দ্র, কালাপদ প্রভৃতি ভক্তগণ সমাগত। ঢাকার কোন কলেজের অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কয়েকজন ভক্ত ভক্তি-ভরে এই গান ধরিলেন।—

আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন॥ ইত্যাদি

ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। তাঁহার মুখে দিব্য প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাস্য। ভক্তগণ নিস্তব্ধ এবং ভাবাবেশে অভিভূত। কীর্তন সমাপ্ত হইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এই ভাবে সাত দিন ব্যাপী বলরাম ভবনে নিত্য আনন্দোৎসব চলিল। ইতোমধ্যে ৫৫বি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী খানি তাঁহার জন্য ভাড়া লওয়া হইল। এই দ্বিতল গৃহে ঠাকুর ভক্তগণের

আগ্রহে ভাদ্র মাসের শেষার্ধে, ১৮৮৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে বলরামের বাটী হইতে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস রহিলেন। তাঁহার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিতে পতিপ্রাণা সারদামণিও তথায় আসিলেন। এখানে আসিবার অল্প দিন পরেই ভক্তগণ পূর্ব পরামর্শ অনুসারে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনিলেন। ডাক্তার সরকার বহু যত্নে ঠাকুরকে পরীক্ষা ও তাঁহার রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন। বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরীশ ও মহেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ যেমন ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যয়ভার লইলেন তেমনি তারক, শশী, নরেন্দ্র, লাটু, শরৎ, কালী প্রমুখ বালক ভক্তগণ তাঁহার সেবাভার লইলেন। সারদা প্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে এই স্থানেই প্রথম দর্শন করেন। দৈনন্দিন ব্যবহারে অসীম মাধুর্য্য ও অদ্ভুত করুণা ঠাকুর সকলের প্রতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন শিল্পী অন্নদা বাগচী প্রমুখ বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক সমাগত। তাঁহারা ছবি আঁকা প্রভৃতি নানা আজে বাজে কথায় প্রমত্ত ছিলেন। একঘর লোকের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া সর্ববিষয়ে সকলের সহিত আনন্দ করিতে ছিলেন। তন্মধ্যে বিশ্বপ্রেম ঘনীভূত হইয়াছিল। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ঠাকুরের অসুস্থতা কোন দিন কিঞ্চিৎ অধিক, কোন দিন বা কিঞ্চিৎ অল্প হইল ; কিন্তু বিশেষ উপকার দেখা গেল না। তিনি স্বীয় মারাত্মক অসুস্থতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভক্তগণকে ধর্ম-পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। লোককল্যাণ সাধনার্থ যিনি অবতীর্ণ তিনি তদ্ব্যতীত অন্য কার্য্য কিরূপে করিবেন ? তাঁহার

সমাধি-প্রবণতা ও ভাবাবেশ দেখিলে মনে হইত, তিনি সত্যই দেহ-বোধরহিত পূর্ণপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ।

ঠাকুরের অপূর্ব দিব্য ভাবের দুই দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভাদ্রের শেষ ভাগে ঠাকুর শ্যামপুকুরে আসিলেন। আশ্বিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া শারদীয়া দুর্গাপূজা সমাগত হইল। ঠাকুরের পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এই বৎসর কলিকাতার সিমলা পল্লীস্থ স্বভবনে প্রতিমায় দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়াছেন। পূর্বে তাঁহার বাটীতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা হইত; কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিঘ্ন ঘটায় দুর্গোৎসব বহু বর্ষ বন্ধ ছিল। দৈব বিঘ্নের ভয়ে ভীত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ—যাঁহাকে ঠাকুর কখন কখন সুরেশ মিত্র বলিতেন—ঠাকুরকে জানাইয়া স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার বহনপূর্বক গভীর ভক্তি সহকারে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিলেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ! তিনি গুরুভ্রাতৃগণকে সপ্রেম নিমন্ত্রণ জানাইলেন। মহানন্দে সপ্তমী পূজা সমাপ্ত হইল। মহাষ্টমী দিবস বৈকালে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের সমীপে একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ধর্মসঙ্গীতাদি করিয়া মহানন্দে মাতোয়ারা আছেন। ডাক্তার সরকার বৈকাল ৪টায় আসিয়া প্রায় ৮টা পর্যান্ত চার ঘণ্টা ছিলেন। সুকণ্ঠ নরেন্দ্রের মধুর সঙ্গীতের স্বর্গীয় স্বর-লহরী শ্রবণে সকলে আত্মহারা হইলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিকটে উপবিষ্ট ডাক্তার সরকারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদু স্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্য চৈতন্য হারাইলেন।

উক্ত কালে ঠাকুরের ঘরে ভাগবত পরিবেশ সৃষ্ট হইল এবং প্রবল

আনন্দ-প্রবাহে ঘর জম্ জম্ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তার সরকার বিদায় লইয়া দাড়াইবা মাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ভক্তগণ কাণাকাণি করিতে লাগিলেন, "এই সময় সন্ধিপূজা কি না ; সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সন্ধি-ক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে।" প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তার সরকার বিদায় লইলেন। অনন্তর ঠাকুর সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ভক্তগণকে এই ভাবে বলিলেন, "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তার ভক্তিতে প্রতিমায় ৺মার আবেশ হইয়াছে। ৺মায়ের তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে ; আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদিগকে দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।" ঠাকুরের নির্দেশ মত নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ অবিলম্বে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন এবং ঠাকুরের দর্শনের সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ানন্দে হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহারা জানিলেন, দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং ঠাকুরের সমাধিকালে অর্থাৎ সন্ধিপূজার সময় সুরেন্দ্র প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল উচ্চৈঃস্বরে বালকবৎ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণ ৪৮ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। সেইদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র

নাথ দত্ত ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন।, ডাক্তার সরকার স্টেথিস্কোপ যন্ত্র সহায়ে দেখিলেন, ঠাকুরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নাই! ডাক্তার দত্ত ঠাকুরের উন্মীলিত নয়নের গোলকে আঙ্গুল লাগাইয়া দেখিলেন, উহা সঙ্কুচিত হয় না! সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্য দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মৃতপ্রায় প্রতীয়মান হইলেও মৃত নহেন! সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি পূর্ববৎ প্রাণবান্ হইয়া উঠেন। নির্বিকল্প সমাধি বিজ্ঞানেরও বিস্ময়! সমাধি জড়ত্ব নহে, চৈতন্যত্বের চরম অনুভূতি।

ক্রমশঃ আশ্বিন অতীত হইল এবং কার্তিক আসিল। এই মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা সমধিক প্রসিদ্ধ। রোগবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঠাকুরের দিব্য আনন্দ ও দিব্য উল্লাস হ্রাস পাইল না। উক্ত কালে ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হইলেন। কোন সময় ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিমায় কালী পূজার সঙ্কল্প করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎভক্তবৃন্দের সম্মুখে কালীপূজা করিলে অধিক আনন্দ হইবে ভাবিয়া তিনি শ্যাম পুকুরের বাড়ীতে উক্ত পূজার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পূজার দ্বারা ঠাকুরের রোগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি উক্ত সংকল্প ত্যাগ করেন। কিন্তু ঠাকুর পূজার পূর্ব দিন কতিপয় ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, "কালীপূজার উপকরণসমূহ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্। কাল কালীপূজা হইবে।" তাঁহার নির্দেশে আনন্দিত হইয়া ভক্তগণ পূজার বিষয় পরস্পর পরামর্শ করিতে বসিলেন। পূজা পঞ্চোপচারে, অথবা ষোড়-শোপচারে হইবে, অন্নভোগ দেওয়া হইবে কিনা, পূজকের পদ কে লইবে—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা বিবিধ জল্পনা করিলেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে ঠাকুর কিছু না বলায় তাঁহারা পূজার জন্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

দীপ, নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীঃ শুক্রবার রাত্রে কালীপূজা। পূজার দিনার্ধ অতীত হইল; তথাপি ঠাকুর এই সম্বন্ধে কাহাকেও অন্য কিছু বলিলেন না। সেদিন পূর্বাহ্ণে ঠাকুরের নির্দেশে মহেন্দ্রনাথ ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে পূজা দিয়া প্রসাদ আনিয়াছেন। ঠাকুর পাদুকা খুলিয়া প্রসাদ হস্তে লইলেন এবং দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে কিঞ্চিৎ গ্রহণ এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে উক্ত ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মাতৃ সঙ্গীতের বই কিনিয়া আনিয়াছেন। এত অসুস্থতা সত্ত্বেও চটিজুতা পায় দিয়া ঠাকুর সহাস্য বদনে স্বীয় কক্ষে পায়চারী করিতে করিতে মহেন্দ্র নাথের সহিত এই সকল সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন। কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশে তিনি চমকিত হইতেছেন। হঠাৎ পাদুকা ছাড়িয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অতিকষ্টে তিনি দিব্য ভাব সম্বরণ করিলেন। আজ কালীপূজা বলিয়া তিনি মুহুর্মুহুঃ চমকিত ও সমাধিস্থ হইতেছেন। বেলা দশটার সময় তিনি শয্যায় বালিশে হেলান দিয়া রহিলেন। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মেজেতে উপবিষ্ট। বৈকাল বেলা দুইটার সময় ডাক্তার সরকার আসিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে মহেন্দ্রনাথ সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের বই দুটী ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার গান শুনিতে চাহিলে মহেন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, কালীপদ ও অন্য এক ভক্ত অনেক গান গাহিলেন। ঐ সব গান শুনিতে শুনিতে মণীন্দ্র, লাটু প্রভৃতি দুই তিনটী বালক ভক্ত ভাবস্থ হইলেন। গত দিন ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আসিয়া ঠাকুরকে নক্স ভমিকা ঔষধ খাইতে দিয়াছেন। ইহা

শুনিয়া ডাঃ সরকার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি ত মরি নাই। নষ্ট ভমিকা দেওয়া কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার সরকার—আমার কোন কালে অবিদ্যা নাই।

ডাক্তার সরকার অবিদ্যার অর্থ নষ্টা নারী বুঝিয়া এই উত্তর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নাগো! সন্ন্যাসীর অবিদ্যা মা মরে যায়, আর বিবেক সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশৌচ হয়। তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি বিদায় লইলেন। ক্রমশঃ সূর্যাস্ত হইল এবং রাত্রি প্রায় সাতটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও পূজার কথা কিছু না বলিয়া অন্য দিনের ন্যায় স্বীয় শয্যায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে পূর্ব দিকে কিঞ্চিৎ স্থান মার্জনা করিলেন এবং তথায় সংগৃহীত পূজা-দ্রব্য-সমূহ রাখিলেন। ইহাতেও ঠাকুর কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। তখন ভক্তগণ মনে করিলেন, ঠাকুর নিজ দেহমনরূপ প্রতীক অবলম্বনে আজ কালীপূজা করিবেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে গন্ধ-পুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন নিজেকেই নিজে পূজা করিতেন। ইহা স্মরণ করিয়াই ভক্তগণ উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ক্রমে ধূপদীপাদি প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ আলোকিত ও সৌরভিত হইল। ইহাতেও ঠাকুরকে স্থির থাকিতে দেখিয়া ভক্তগণ তৎসমীপে নীরবে বসিলেন। ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উপবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কক্ষ জনশূন্য প্রতীত হইল। ঠাকুর স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হইলেন না; কিম্বা কাহাকেও পূজা করিতে বলিলেন না। যুবক ভক্তগণের সহিত

মহেন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রবীণ ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্র নিশ্চয় করিলেন, ঠাকুরের শরীররূপ জাবন্ত প্রতিমায় কালীপূজা করিয়া ভক্তগণ আজ কৃতার্থ হইবেন। অনন্তর তিনি দিব্যোল্লাসে অধীর হইয়া সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাস্যে উদ্‌ভাসিত হইল। তাঁহার হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণ পূর্বক তাঁহাতে মা কালীর আবেশ সূচিত করিল। যাঁহারা কিঞ্চিৎ দূরে ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন, ঠাকুরের দেহাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী কালী প্রতিমা সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আবিভূর্তা। বিশ্বাসী-বরিষ্ঠ গিরীশ চন্দ্রকে বারম্বার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দনাদি লইয়া ঠাকুরের পাদপদ্ম পূজা করিলেন। তাঁহাদের মুখ-নিস্থত জয় জয় রবে গৃহ মুখরিত হইল।

নিরঞ্জন ঠাকুরের চরণে গন্ধপুষ্প দিয়া 'মা ব্রহ্মময়ী' 'মা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া পাদস্পর্শপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গিরীশ ঠাকুরকে স্তব করিলেন এবং গান গাহিলেন। মাষ্টার, বিহারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উহাতে যোগ দিলেন। যতক্ষণ ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন ততক্ষণ উক্ত কক্ষে দিব্যভাব ঘনীভূত হইয়াছিল। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া একটি মাতৃসঙ্গীত গাহিতে আদেশ দিলেন। উক্ত সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আর একটি গান করিতে বলিলেন এবং অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থায় একটু পায়স নিজ মুখে দিলেন। অনন্তর ভক্তবৃন্দ উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সর্ব শেষে ঠাকুর ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির

জন্য ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে কালীপূজা দেখিতে পাঠাইলেন। সেদিন ভক্তবৃন্দ যে দিব্য হাস্যফুল্ল প্রসন্নানন ও বরাভয়যুক্ত রামকৃষ্ণ মুর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন তাহা চিরকাল তাঁহাদের অন্তরে জাগরূক থাকিবে।

শ্যামপুকুরে ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি ঢাকায় অবস্থান কালে গৃহ মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার সময় ঠাকুরকে তথায় সশরীরে আবির্ভূত দেখেন ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহস্তে স্পর্শ করেন। তিনি কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিলেন এবং ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তখন নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্ত্তী, ভূপতি, লাটু, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন, "বুঝেছি, আপনি কে! আর বলতে হবে না।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইলেন এবং বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া নিজ বক্ষে তাঁহার চরণ ধরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চিত্রাপিতবৎ সমাধিস্থ। এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া কোন ভক্ত কাঁদিতেছেন; কেহ বা স্তব করিতেছেন। মহিমাচরণ সাশ্রু নয়নে গান গাহিলেন। ভূপতিও দুইটি গান করিলেন। বহুক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এমন সময় ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া ডাক্তার সরকার গান শুনিতে চাহিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গান ধরিলেন এবং অন্য বাদ্যও হইতে লাগিল। গান শুনিয়া বিজয়াদি ভক্তবৃন্দ ভাবোন্মত্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ দেহের কঠিন ব্যাধি ভুলিয়া দাঁড়াইয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার সরকারও বেহুঁস হইয়া

দণ্ডায়মান। লাটু ও ছোট নরেনের ভাবসমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে সকলে শান্ত হইলেন।

পরদিন ১১ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর ১৮৮৫) সোমবার ঠাকুরকে ডাক্তার সরকার দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঠাকুরের কণ্ঠ-দেশে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ নীরবে দুঃখাশ্রু বিসর্জন করেন। নরেন্দ্রাদি বালক ভক্তগণ গুরু-সেবায় প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা ঠাকুরের কথামৃত পান ও পূত সঙ্গ লাভ করেন। দলে দলে লোক ঠাকুরের কাছে আসিতেছেন এবং শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক কৃপাসিন্ধু এবং সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি হাস্যমুখে সকলের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন। ডাক্তার সরকার বলেন, "আর কাহারও সহিত কথা কহা হবে না; কেবল আমার সহিত কথা কহিবে।" ঠাকুর ডাক্তার সরকারের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিবার সময় স্বীয় জীবনের পূর্ব কথা এই ভাবে ব্যক্ত করেন, "ছেলে বেলায় তাঁতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়েছিল। এগার বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম! সবাই বল্লে, বেহুঁস হয়ে গেছলুম; কোন সাড়া ছিল না! সেইদিন থেকে আর একরকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো; আর ফুল চন্দন মাথায় দিতুম! যে ছোকরা আমার কাছে থাকত, সে ভয়ে আমার কাছে আসতো না; বোলতো তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার কাছে বেশী যেতে ভয় হয়!"

পরদিন ২৭শে অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলবার বৈকাল ৫॥০ টায় ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরীশ, নরেন্দ্র, রাখাল ও মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত আছেন। ডাক্তার সরকার আসিয়া ঠাকুরের হাত দেখিলেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। নরেন্দ্র মধুর কণ্ঠে তানপুরা ও মৃদঙ্গ সহযোগে গান গাহিলেন। তাঁহার গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ, নয়ন যুগল পলকশূন্য! তিনি কাষ্ঠময় পুত্তলিকাবৎ উপবিষ্ট ও অন্তর্মুখ। গান শেষ হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি পুনরায় ভগবৎপ্রসঙ্গে প্রমত্ত হইলেন। সভাস্থ লোকসমূহ নিস্তব্ধ। সকলে নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ধর্ম প্রসঙ্গ শুনিতেছেন। শ্যাম বসু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঠাকুর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "পঞ্চ ভূত নিয়ে যে দেহ তাহা স্থূল। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত দ্বারা সূক্ষ্ম দেহ নির্মিত। যে শরীরে ভাগবত আনন্দ লাভ ও সম্ভোগ হয় তাহা কারণ শরীর। তন্ত্রে ইহাকে ভাগবতী তনু বলে। সকলের অতীত মহাকারণ শরীরকে মুখে বর্ণনা করা যায় না।" ডাক্তার সরকার বুদ্ধদেবের কথা তুলিলেন। ঠাকুর শ্যাম বসুকে গার্হস্থ্য-ধর্ম সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন, "সংসার-ধর্মে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে সংসারের কাজ করবে। যদি কারো পিঠে একটা ফোঁড়া হয় সে যেমন সকলের সঙ্গে কথা কয়, হয় তো কাজও করে; কিন্তু ফোঁড়ার দিকে সর্বদা তার মন পড়ে থাকে, তেমনি ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে থাকবে। সংসারে নষ্টা নারীর মত থাকবে। তার মন উপপতির দিকে; কিন্তু সংসারের সমস্ত কাজ করে।"

বলরাম বসুর ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু কটকের প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি ঠাকুরের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি গিরীশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু। গিরীশচন্দ্র একদিন তাঁহাকে লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সহসা স্পর্শ করিয়া সহাস্যে কথা বলিলেন। তখন হরিবল্লভ বাবু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। ঠাকুর এইরূপে আগন্তুককে স্পর্শ করিয়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন ভক্তগণকে ইহার কারণ এইরূপে নির্দেশ করেন।—"অহংকারের বশবর্তী হইয়া, অথবা আমি কাহারো অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি, এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর যে আছে তাহাকে স্পর্শ মাত্র তাহার দিব্য শক্তি প্রভাবে লোকদের উক্ত ভাব আর মাথা তুলিতে পারে না। সর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওষধিস্পৃষ্ঠ হইয়া মাথা নীচু করে, তাহাদের অন্তরের অহংকারও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। এইজন্য কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকি।"

স্বামী সারদানন্দ বলেন, "শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।" ভিন্ন ভিন্ন জিজ্ঞাসুকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি জনৈক যুবককে সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানা আসন ও অঙ্গসংস্থান দেখাইতে ছিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ স্থাপনপূর্বক এই ভাবে উভয়

হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার সাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে উক্ত আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও ডান হস্তদ্বয় বাম ও ডান জানুর উপর রাখিয়া প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর অঙ্গুলীসমূহ সরল এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন।" এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জোরে মনকে সাধারণ জ্ঞান-ভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, "আর দেখান হইল না। এইরূপে বসিলেই উদ্দীপনা আসিয়া মনকে তন্ময় ও সমাধিলীন করে এবং বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে। এই জন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে ডাক্তার বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।" উক্ত যুবক ইহাতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কেন ঐ সকল দেখাতে গেলেন? আমি ত এই সব দেখিতে চাহি নাই।" ঠাকুর করুণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তা ত বটে; কিন্তু তোদের একটু আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ?" ঠাকুরের অপার করুণা ও অলৌকিক সমাধিপ্রবণতা অন্ত্যলীলায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষ বর্ষে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন তাহাতে জিজ্ঞাসুর সংশয় চিরতরে নিরসন হইত। গিরীশ ঘোষের ছোট ভাই অতুল ঘোষ উপেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের কাছে যান। উপেন্দ্র বাবুর তিন প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু তিনি প্রথমে অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রশ্ন করাইলেন; কিন্তু এইরূপে যে উত্তর পাইলেন তাহা তাঁহার মনোমত হইল না। পরে তিনি সাহস-ভরে তিন প্রশ্নের মধ্যে একটি মাত্র স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঈশ্বর

সাকার না নিরাকার? আর তিনি যদি দুই-ই হন তাহা হইলেই বা এক সঙ্গে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাবের একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভব?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই; যেমন জল আর বরফ।" এই উত্তরে জিজ্ঞাসুর সন্দেহ সম্যক্ নিরাকৃত হইল। তিনি একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর পাইয়া বাহিরে উঠিয়া আসিলেন এবং সঙ্গীবন্ধু অতুল ঘোষকে বলিলেন, "এক উত্তরে আমার তিন প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।" যাঁহারা সত্য-দ্রষ্টা বা আত্ম-জ্ঞানী তাঁহাদের বাক্যে জিজ্ঞাসুর সংশয় সহজে দূরীভূত হয়।

শ্যামপুকুরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত দর্শন লাভ করেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলার সংযোগ-স্থলে পৃষ্ঠ দেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। তিনি ইহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ ভাবিতেছেন, এমন সময় জগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের পাপভার তাহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাহার শুদ্ধ দেহে ক্ষতরোগ হইয়াছে।" তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে পূর্বে বলিয়াছেন যে, মানব কল্যাণ সাধনার্থ তিনি বহু বার দেহধারণ ও দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন। বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, ঈশ্বরের অবতার পাপীর পাপভার গ্রহণ করেন। ইহা যে কত সত্য তাহা ঠাকুরের দর্শন দ্বারা প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রোক্ত সত্যসমূহ ঠাকুরের জীবনে নিঃসন্দেহে পরীক্ষিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বেদ সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ-ভূমি।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে ঠাকুর একদিন গিরীশ ঘোষের' নাট্য-শালায় ধর্মমূলক নাটকাভিনয় দেখিতে যান। উক্ত অভিনয়ের প্রধান অভিনেত্রীর পটুতাকে তিনি প্রশংসা করেন। অভিনয় শেষ হইলে প্রশংসিতা অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদবন্দনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন হইতে তিনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং আর একবার তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে আছেন শুনিয়া স্বপরিচিত কালীপদ ঘোষের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁহাকে আনিলে ভক্তদের আপত্তি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করেন। এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাঁহাকে পুরুষের ন্যায় হ্যাট, কোট ও প্যাণ্ট পরাইয়া ঠাকুরের নিকট ছদ্মবেশে আনিলেন। বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ভক্তদের নিকট কালীপদ তাঁহাকে নিজ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের কাছে তখন কেহই ছিলেন না। সেই জন্য কালীপদ ঠাকুরের নিকট সঙ্গীবন্ধুর যথার্থ পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। ইহা শুনিয়া রঙ্গপ্রিয় রামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাহস ও দক্ষতা প্রশংসাপূর্বক তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাগত থাকিবার জন্য পুরুষ-বেশী অভিনেত্রীকে দুই চারিটি তত্ত্বকথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। তিনিও সাশ্রু নয়নে ঠাকুরের চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

শ্যামপুকুরে খ্রীষ্টান ধর্ম যাজক প্রভু দয়াল মিশ্র ঠাকুরকে দর্শন

করিতে আসেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশে জাত এবং গেরুয়া পরিহিত ছিলেন। কিন্তু জীশু খ্রীষ্টকে ইষ্টদেব রূপে পূজা করিতেন। তিনি হবিষ্যান্ন-ভোজী ও যোগসাধননিষ্ঠ ছিলেন। নিয়মিত যোগাভ্যাসের ফলে তিনি জ্যোতিঃদর্শনাদি লাভ করেন। সেদিন নরেন্দ্র প্রভৃতি বহু ভক্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রভুদয়ালের সহিত ধর্মালোচনা এবং একত্রে ঠাকুরের প্রসাদ মিস্টান্নাদি ভোজন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ইনি সাক্ষাৎ জীশু খ্রীষ্ট স্থানে ভক্তি করিতেন।

এইরূপে শ্যামপুকুরে ঠাকুর প্রায় তিন মাস কাল অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার গলরোগের উপশম অল্প মাত্রও হইল না। কলিকাতার রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্য ঠাকুরের গলরোগ সারিতেছে না ভাবিয়া ডাক্তার সরকার সহরের বাহিরে কোন বাগান-বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ভক্তগণ তদনুযায়ী কাশীপুরের উদ্যান-বাটী ভাড়া লইলেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির এক দিন পূর্বে অপরাহ্নে তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন।

দুই

কাশীপুরে

শ্যামপুকুরে কিঞ্চিদধিক তিন মাস থাকিবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৯১ সালে অগ্রহায়ণের শেষে (১৮৮৫খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর) কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে গমন করেন। উক্ত রমণীয় স্থানে তিনি প্রায় আট মাস ছিলেন। উক্ত বাটীর মাসিক ভাড়া আশি টাকা জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার পরম ভক্ত সিমলা-পল্লী নিবাসী ও ডফ্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরাণী মেরাণী ছাপোষা লোক। এরা অত টাকা চাঁদায় তুলতে কেমন করে পারবে? অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" ভক্ত সুরেন্দ্রনাথও করযোড়ে "যাহা আজ্ঞা" বলিয়া ভাড়া দিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রসিদ্ধ লালা বাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপাল লাল ঘোষ উক্ত বাটির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রথমে ছয় মাসের এবং পরে আরও তিন মাসের অঙ্গীকার-পত্র প্রদানে বাড়ীখানি ভাড়া লওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ অঙ্গীকার-পত্রে সহি করেন।

বাগবাজার হইতে বরাহনগর যাইবার যে প্রশস্ত পুরাতন পথ আছে কাশীপুর উদ্যান-বাটী তদুপরি অবস্থিত। উদ্যানটী পরিমাণে আন্দাজ চৌদ্দ পনের বিঘা হইবে। আম্র, পনস, লীচু প্রভৃতি ফলের গাছ

এবং নানা ফুলের গাছে তখন ইহা পরিপূর্ণ ছিল। বাড়ীখানি দ্বিতল। উহার উপর তলায় দুইখানি ঘর। তন্মধ্যে প্রশস্ত ঘরখানিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীর-বেষ্টিত অল্পপরিসর ছাদ। এই ছাদে ঠাকুর কখন কখন বেড়াইতেন বা বসিতেন। শ্যামপুকুর বাটীর রুদ্ধ বায়ু হইতে উক্ত উদ্যানবাটীতে প্রথমে যখন ঠাকুর আসিলেন তখন তিনি উহার মুক্ত বায়ুর স্পর্শে প্রফুল্ল চিত্তে চারি দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। আবার দ্বিতলস্থ ঘরে প্রবেশ করিবার পর ছাদে যাইয়া উদ্যানের শোভা কিছুক্ষণ দেখিলেন। নুতন স্থানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল। শ্যামপুকুরের ন্যায় কাশীপুরেও তাঁহার খাবারের সব খরচ পরম ভক্ত বলরাম বসু দিতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার পূর্বে কালীবাড়ীতে তিনি বলরামকে একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশ জনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে, এটা আমার নিতান্ত রুচি-বিরুদ্ধ। কারণ, কখনো ঐরূপ করি নাই। যদি বল, 'তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঐরূপ করিতেছি কিরূপে? কর্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে?' তাহাতে বলি, এখানেও আমায় চাঁদায় খাইতে হইতেছে না। রাণী রাসমণির সময় হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, পূজা করিবার কালে মাসে মাসে ৭৲ টাকা করিয়া যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্য এখানে আমি একরূপ 'পেন্সিলে' (পেন্সনে) খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের

বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ভক্তবীর বলরাম গুরুর আদেশ অবনত মস্তকে শিরোধার্য্য করেন। রাম দত্ত, গিরীশ ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি প্রবীণ গৃহী ভক্তগণ অন্যান্য ব্যয় চালাইতেন।

কাশীপুরে আসিবার কয়েকদিন পরেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চারি দিকে উদ্যান-পথে কিছুক্ষণ বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুর স্পর্শে বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্য্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। ডাক্তারের পরামর্শে পুষ্টিকর পথ্য ব্যবহারে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার দুর্বলতা অনেকটা কমিয়া যায় এবং তিনি পূর্ববৎ সুস্থ বোধ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এখানেও চলিল। পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার পূর্বের ন্যায় সারদা দেবীর হাতেই রহিল। তিনি মধ্যাহ্নের পূর্বে এবং সন্ধ্যার পরে স্বহস্তে প্রস্তুত পথ্য স্বয়ং লইয়া যাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইয়া আসিতেন। তাঁহার সহকারিণী ও সঙ্গিনী রূপে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী তথায় থাকিতেন। স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ ঠাকুরকে দেখিতে যাইয়া শ্রীমার সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখনো কখনো কয়েক দিন তথায় কাটাইতেন। দুর্বলতার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাইতে অক্ষম হইলেন তখন গৃহমধ্যেই তাহার ব্যবস্থা হইল এবং লাটু উহা পরিষ্কার করিবার ভার লইলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, শশী, লাটু, তারক, গোপালদাদা, কালী, শরৎ ও ছুট্‌কো গোপাল এই দ্বাদশজন শিষ্যই প্রধানতঃ গুরুসেবার মহাব্রত উদ্‌যাপন করেন। সেইজন্য ইঁহারা গৃহে গমন এবং অধ্যয়নাদি বন্ধ করিলেন।

সারদাপ্রসন্ন পিতার নির্য্যাতনে বেশী আসিতে পারিতেন না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই এক দিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইতেন। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিতেন। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষা দিবার জন্য উক্ত বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। বাস্তুভিটার বিভাগ লইয়া জ্ঞাতিদের সহিত তখন হাইকোর্টে তাহার মোকদ্দমা চলিতেছিল। এই উভয় কারণে কলিকাতায় তাঁহার অবস্থান একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও গুরুসেবার জন্য তিনি কাশীপুরেই রহিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বালক ভক্তগণ গুরু-সেবায় প্রাণপণে ব্রতী হইলেন। তিনি অবসর সময়ে গুরু-ভ্রাতাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ ও শাস্ত্রচর্চ্চা ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতেন যে, পরমানন্দে কিরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। ঠাকুরের বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ স্নেহ এবং নরেন্দ্রের অপূর্ব প্রীতি ও সৎসঙ্গ তাঁহাদিগকে এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও তাঁহারা পরস্পরকে সত্য সত্যই স্বজন ও আত্মীয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সংঘ-তরু দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে পল্লবিত ও পরিবর্ধিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, "ভক্তদের মধ্যে কাহারা অন্তরঙ্গ ও কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে নিরূপিত হইবে।" তাঁহার কথার সত্যতা কাশীপুরে প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হইল।

কলিকাতার বহুবাজার পল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের বংশধর হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্রলাল দত্ত ডাঃ মহেন্দ্রলালের বন্ধু ছিলেন। তিনি

লোকমুখে ঠাকুরের ব্যাধির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং রোগের আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্ত জানিয়া ডাঃ সরকারের সম্মতিক্রমে লাইকোপোডিয়াম (২০০) ঔষধ প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে দুই সপ্তাহাধিক বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তিনি গুল্‌চি ফুল ভাল বাসিতেন। শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) কাশীপুরে অবস্থান কালে মতি শীলের উদ্যান ঘাটে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। তিনি ঘাটের পার্শ্বে অবস্থিত বৃহৎ গুলচি ফুলের গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া ঠাকুরকে প্রায়ই উপহার দিতেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে বোঝা যায়, বালক ভক্তগণ তদীয় গুরুকে কত ভক্তি করিতেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুরকে কাশীপুর বাগানে দেখিতে আসিয়া ঠাকুরকে বলেন, "মহাশয়, আপনার মত মহাপুরুষ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দৈহিক রোগ সারাইতে পারেন। আরোগ্যের সংকল্প লইয়া রোগাক্রান্ত অংশে মন একাগ্র করিলে রোগ সারিয়া যাইবে। আপনি সেরূপ করেন না কেন?" ইহা শুনিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুমি পণ্ডিত হয়ে একি নির্বোধ প্রস্তাব করলে? এই মন চিরকালের জন্য ঈশ্বরকে দিয়েছি। কিরূপে মনকে তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে এই অসার দেহের উপর দিই?" মৃত্যুশয্যায়ও ঈশ্বরের উপর ঠাকুরের এইরূপ নির্ভরতা ছিল। শশধর নীরব হইলেন; কিন্তু নরেন্দ্র প্রমুখ শিষ্যগণ ছাড়িলেন না। উক্ত পণ্ডিত চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা এইরূপ করিতে ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "অন্ততঃ আমাদের জন্য আপনার অসুখ সারাতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কি মনে কর, আমি ইচ্ছা করে ভুগছি? আমি সুস্থ হতে চাই। কিন্তু তা কিরূপে সম্ভব? ৺মায়ের ইচ্ছা বলবতী।

নরেন্দ্র—তাহলে আপনার আরোগ্যের জন্য তাঁকে জানান। তিনি আপনার কথা না শুনে পারবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমাদের পক্ষে একথা বলা সহজ; কিন্তু আমি এরূপ কথা বলতে পারি না।

নরেন্দ্র—না মশায়, তা হবে না। অন্ততঃ আমাদের অনুরোধ কালীমার কাছে একথা জানাতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি চেষ্টা করব, যদি বলতে পারি।

কয়েক ঘণ্টা পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ৺মাকে জানিয়েছিলেন কি? তিনি কি বললেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাঁকে বললাম, "গলাব্যথার জন্য আমি কিছু খেতে পারি না। এরূপ করে দাও, যাতে একটু খেতে পারি।" তিনি তোমাদের দেখিয়ে বললেন, "কেন তুমি তো এত মুখে খাচ্ছ!" আমি লজ্জিত হয়ে আর একটি কথাও বলতে পারলাম না।

দেহের প্রতি কি অলৌকিক ঔদাসীন্য! কি গভীর অদ্বৈতজ্ঞান!

১৮৮৫ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে ঠাকুর বিশেষ প্রফুল্ল ছিলেন। তিনি নিরঞ্জনকে বলিলেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসি।" তিনি কালীপদের বুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার চৈতন্য হোক্।" সেই প্রাতে দুইটি স্ত্রী-ভক্তও ঠাকুরের কৃপা লাভে ধন্যা হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর পদ দ্বারা মহিলা যুগলের বক্ষ স্পর্শ করিলেন। তন্মধ্যে একজন ইহার ফলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আহা! আপনি এত কৃপাময়! ঠাকুর বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সন্ধ্যায় তিনি শ্রীমাকে বলিলেন, "আমার লোক-শিক্ষার কাজ প্রায় সমাপ্ত। এখন আর লোকশিক্ষা দিতে পারি না। সমগ্র জগৎ ঈশ্বরময়

দেখছি। কখন কখন মনে হয়, কাকে শিক্ষা দেব?" তখন নিরঞ্জন বাড়ী হইতে ফিরিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, আমার প্রতি তোর কি একটু টান হয়েছে ?" নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, "মহাশয়, আগে আপনাকে ভালবাসতাম। এখন আপনাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব।"

নিরঞ্জনও শ্রীগুরুর সেবা করিতেন এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সেরে গেলে তুই কি করবি নিরঞ্জন?" গুরুভক্ত শিষ্য আনন্দোন্মত্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "বাগানে এই যে খেজুর গাছটা আছে সেটা উপড়ে ফেলবো!" গুরু সহাস্যে শিষ্যকে সায় দিয়া বলিলেন, "তা তুই পারবি।"

শ্রীম ঠাকুরকে বলিলেন, "মশায়, সেদিন আমি বুঝলাম, কি কষ্ট-ভোগ করে এই বালক ভক্তরা এখানে আসে এবং আপনার সেবা করে।" এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুরের হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত হইল এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। বাহ্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "দেখলাম, সব সাকার থেকে নিরাকারে চলে যাচ্ছে। আমি আরো প্রকাশ করতে চাই; কিন্তু পারছি না। আচ্ছা, নিরাকারের দিকে ঝোঁকটা কি আসন্ন দেহরক্ষার চিহ্ন নয়?" ভক্তবর মহেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "সম্ভবতঃ তাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এমন কি, এখনো নাম-রূপবর্জিত সচ্চিদানন্দ সাগর দেখছি! অতি কষ্টে মনকে নামিয়ে রাখছি। এই অসুখে বুঝা যাবে, কারা অন্তরঙ্গ ভক্ত; আর কারা বহিরঙ্গ। যারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে এখানে আছে তারাই অন্তরঙ্গ; আর যারা মাঝে মাঝে এসে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছেন, তারা বহিরঙ্গ।

১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী শুক্রবার ঠাকুর কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন এবং বাগানে একটু বেড়াইতে ইচ্ছা করিলেন। বৈকাল প্রায় ৩টায় ছুটির দিন বলিয়া প্রায় ত্রিশজন গৃহীভক্ত উপস্থিত। কেহ কেহ বড় ঘরে এবং অপর সকলে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। ঠাকুর যখন নামিলেন তখন বড় ঘরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। গিরীশ, রাম, অতুল প্রভৃতি ভক্তগণ, যাহারা গাছের তলায় গল্প করিতেছিলেন, ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ গিরীশকে বলিলেন, "আচ্ছা গিরীশ, তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ যে, সকলের সম্মুখে আমাকে অবতার বলে প্রচার কর।" গিরীশ এই প্রশ্নে আদৌ অপ্রতিভ না হইয়া করজোড়ে নতদেহে ভক্তিভরা কণ্ঠে বলিলেন, ব্যাস, বাল্মিকী মুনি-ঋষিগণ যাঁর মহিমা বর্ণনা করিতে পারেন নি আমার মত নগণ্য মানুষ তাঁর মহিমা কিরূপে বর্ণনা করিতে পারে?"

ভক্তিভরে উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আর কি বলব? তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের চৈতন্য হোক্।" এই বলিয়া তিনি অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণ ঠাকুরের আশীর্বাণী শুনিয়া আনন্দোন্মত্তভাবে ঠাকুরের পাদস্পর্শ না করিবার সঙ্কল্প ভুলিলেন। ভক্তিভাবের আতিশয্যে তাঁহারা ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তগণের ভক্তি-প্রকাশে ঠাকুরের কৃপা শতধারে প্রবাহিত হইল। তিনি প্রত্যেক ভক্তকে স্পর্শ করিয়া যথাযোগ্য আশীর্বাদ করিলেন। ঠাকুরের শক্তিপূত সংস্পর্শে ভক্তগণের মনে ভাববিপ্লব আসিল। কেহ কেহ ভাবাবেশে হাসিলেন, কেহ কেহ

কাঁদিলেন, কেহ কেহ ধ্যানে বসিলেন, আর কয়েক জন দূরস্থিত অনাগত ভক্তগণকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। নরেন্দ্র প্রমুখ কয়েকটি বালক ভক্ত পূর্বরাত্রে অনেকক্ষণ ঠাকুরের সেবা এবং ধ্যানভজনে নিমগ্ন থাকায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা জাগিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরের কাছে আসিলেন। লাটু ও শরৎ এই সুযোগে ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করিতে এবং বিছানাদি রৌদ্রে দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ছাদ হইতে এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়াও স্ব স্ব কর্তব্য পালনে নিযুক্ত রহিলেন।

বালক ভক্তগণের আগমনে ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কক্ষে ফিরিলেন। ভক্তগণ শান্তভাব ধারণ করিবার পর বুঝিলেন, ঠাকুর নির্বিচারে তাঁহাদের উপর কৃপা বর্ষণ করিলেন। ঠাকুরের পূত স্পর্শে ভক্তগণের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হইল। ধ্যানে কেহ পরমানন্দ পাইলেন, কেহ বা ধ্যেয় মূর্তির স্পষ্টতর দর্শন, কাহারো বা জ্যোতিঃদর্শন, কাহারো বা অদ্ভুত শক্তিলাভ হইল। ঠাকুরের কৃপায় যে এই সকল অলৌকিক অনুভূতি হইল, ইহা কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না। এই প্রসঙ্গে হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ঠাকুরের নিকট সেদিন অপূর্ব কৃপা লাভ করেন। ঠাকুরকে যেই তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন, ঠাকুর অমনি ভাবাবেশে তাঁহার মস্তকে পদ স্থাপন করেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বলেন, "পূর্বে আমি ইষ্ট মূর্তির কোন কোন অংশ ধ্যানে দেখিতাম। কিন্তু সেদিন ধ্যেয় দেবের সমগ্র মূর্তি আমার মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, ইষ্টদেবের সুস্পষ্ট জীবন্ত মূর্তি আমার হৃদয়ে উপবিষ্ট।" বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল বলেন, "দুই তিনজন ভক্ত কৃপাপ্রাপ্ত হইবার পর আমি অগ্রসর হইয়া ঠাকুরকে

প্রণামপূর্বক আশীষ চাহিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তো সব পেয়েছ। আমি করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলাম, আমাকে তা বুঝিয়ে দিন। তিনি 'আচ্ছা' বলিয়া আমার বুক সামান্য স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে আমার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। আমি সর্ব বস্তুতে ঠাকুরের আনন্দময় মূর্তি দেখিতে পাইলাম। আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমি চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিলাম, ঠাকুরের আশীষ গ্রহণ করিবার জন্য। সে দর্শন কয়েকদিন ধরিয়া আমাকে অভিভূত রাখিল এবং উহার ফলে আমার কাজকর্মের ক্ষতি হইল। ইহার অভিভবকারিণী শক্তি সহনে অসমর্থ হইয়া ইহার প্রাবল্য হ্রাস করিবার জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইলাম। তৎপরে মাঝে মাঝে দর্শন হইতে লাগিল।" এই ঘটনার পরে ঠাকুর সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করিলেন। ভক্তগণের পাপ রাশি গ্রহণের জন্য এই গাত্রদাহ হইল। তিনি পূত গাঙ্গ বারি স্বশরীরে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দত্তের মতে ঠাকুর সেদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন; ভক্ত রামচন্দ্র তৎপ্রতিষ্ঠিত যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসব প্রত্যেক বৎসর পয়লা জানুয়ারী করিতেন। স্বামী সারদানন্দের মতে ঠাকুর সেদিন আত্মপ্রকাশে অভয়দান করেন।

এই সময়ে নরেন্দ্র অনুভূতি লাভের জন্য তীব্র আগ্রহে অস্থির ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারী শনিবার ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ তিনি হৃদয়ে অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব করিলেন, তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইলেন। কয়েক দিন পরে তিনি শ্রীমকে এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় স্পষ্ট দেখলাম এবং হাজরাকে আমার বুকটা দেখতে বললাম। গতকাল দোতলায়

ঠাকুরকে আমি বলেছিলাম, 'সকলে অনুভূতিলাভে ধন্য হয়েছে। আমারো কিছু হোক। যখন সকলে পেয়েছে, আমি একা কেন বাকী থাকি?' তিনি বলিলেন, 'তোর বাড়ীর একটা বন্দোবস্ত করে আয়, সব পাবি। তুই কি চাস্?' আমি বল্লাম, 'আমি তিন চার দিন একটানা সমাধিস্থ থাকতে চাই, কেবল খাবার জন্য মাঝে মাঝে একটু উঠব।' তিনি বল্লেন, 'তুই বোকা। তার চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে। তুই কি এই গান গাস না, 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।' তোর বাড়ীর একটা ব্যবস্থা করে এলে সমাধির চেয়েও উচ্চতর অবস্থা তুই লাভ করবি।"

১৮৮৬ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় নিরঞ্জন, শশী এবং শ্রীম ঠাকুরের নিকট উপবিষ্ট। ঠাকুর একটু ঘুমাইয়া উঠিলেন। তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যন্ত্রণাও খুব বাড়িয়াছে। তথাপি তিনি অস্পষ্ট স্বরে বা ইঙ্গিতে নরেন্দ্র সম্বন্ধে কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "নরেন্দ্রের কি অদ্ভুত অবস্থা দেখ! এক সময় সে সাকার মানত না; এখন অনুভূতির জন্য ছট্‌ফট্ করছে।" তৎপরে তিনি ইঙ্গিত করিলেন যে, নরেন্দ্র শীঘ্র সমাধি লাভ করিবেন। তিনি রোগ-শয্যায় থাকিয়া নীরবে নরেন্দ্র প্রমুখ বালক শিষ্যগণকে সন্ন্যাস জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। এক দিন তিনি তাঁহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সকলে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অপক্ক আহার্য রন্ধন করিলেন। ঠাকুর উহা হইতে দুই একটি দানা ভাত লইয়া খাইয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এই অন্ন খুব শুদ্ধ।" বালক শিষ্যগণ গেরুয়াধারী

প্রণামপূর্বক আশীষ চাহিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তো সব পেয়েছ। আমি করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলাম, আমাকে তা বুঝিয়ে দিন। তিনি 'আচ্ছা' বলিয়া আমার বুক সামান্য স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে আমার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। আমি সর্ব বস্তুতে ঠাকুরের আনন্দময় মূর্তি দেখিতে পাইলাম। আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমি চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিলাম, ঠাকুরের আশীষ গ্রহণ করিবার জন্য। সে দর্শন কয়েকদিন ধরিয়া আমাকে অভিভূত রাখিল এবং উহার ফলে আমার কাজকর্মের ক্ষতি হইল। ইহার অভিভবকারিণী শক্তি সহনে অসমর্থ হইয়া ইহার প্রাবল্য হ্রাস করিবার জন্য ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইলাম। তৎপরে মাঝে মাঝে দর্শন হইতে লাগিল।" এই ঘটনার পরে ঠাকুর সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করিলেন। ভক্তগণের পাপ রাশি গ্রহণের জন্য এই গাত্রদাহ হইল। তিনি পূত গাঙ্গ বারি স্বশরীরে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দত্তের মতে ঠাকুর সেদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন; ভক্ত রামচন্দ্র তৎপ্রতিষ্ঠিত যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসব প্রত্যেক বৎসর পয়লা জানুয়ারী করিতেন। স্বামী সারদানন্দের মতে ঠাকুর সেদিন আত্মপ্রকাশে অভয়দান করেন।

এই সময়ে নরেন্দ্র অনুভূতি লাভের জন্য তীব্র আগ্রহে অস্থির ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারী শনিবার ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ তিনি হৃদয়ে অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব করিলেন, তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইলেন। কয়েক দিন পরে তিনি শ্রীমকে এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় স্পষ্ট দেখলাম এবং হাজরাকে আমার বুকটা দেখতে বললাম। গতকাল দোতলায়

ঠাকুরকে আমি বলেছিলাম, 'সকলে অনুভূতিলাভে ধন্য হয়েছে। আমারো কিছু হোক। যখন সকলে পেয়েছে, আমি একা কেন বাকী থাকি?' তিনি বলিলেন, 'তোর বাড়ীর একটা বন্দোবস্ত করে আয়, সব পাবি। তুই কি চাস্?' আমি বললাম, 'আমি তিন চার দিন একটানা সমাধিস্থ থাকতে চাই, কেবল খাবার জন্য মাঝে মাঝে একটু উঠব।' তিনি বল্লেন, 'তুই বোকা। তার চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে। তুই কি এই গান গাস না, 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।' তোর বাড়ীর একটা ব্যবস্থা করে এলে সমাধির চেয়েও উচ্চতর অবস্থা তুই লাভ করবি।"

১৮৮৬ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় নিরঞ্জন, শশী এবং শ্রীম ঠাকুরের নিকট উপবিষ্ট। ঠাকুর একটু ঘুমাইয়া উঠিলেন। তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যন্ত্রণাও খুব বাড়িয়াছে। তথাপি তিনি অস্পষ্ট স্বরে বা ইঙ্গিতে নরেন্দ্র সম্বন্ধে কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "নরেন্দ্রের কি অদ্ভুত অবস্থা দেখ! এক সময় সে সাকার মানত না; এখন অনুভূতির জন্য ছট্‌ফট্ করছে।" তৎপরে তিনি ইঙ্গিত করিলেন যে, নরেন্দ্র শীঘ্র সমাধি লাভ করিবেন। তিনি রোগ-শয্যায় থাকিয়া নীরবে নরেন্দ্র প্রমুখ বালক শিষ্যগণকে সন্ন্যাস জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। এক দিন তিনি তাঁহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সকলে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অপক্ক আহার্য রন্ধন করিলেন। ঠাকুর উহা হইতে দুই একটি দানা ভাত লইয়া খাইয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এই অন্ন খুব শুদ্ধ।" বালক শিষ্যগণ গেরুয়াধারী

সন্ন্যাসী রূপে অদূর ভবিষ্যতে ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ এবং ধর্মপ্রচার করিতে পারিবেন দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন। সেই বৎসর শিবরাত্রিতে বালক ভক্তগণ বহুঘণ্টা ধ্যান-ভজনে কাটাইলেন।

ঠাকুর এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী। নরেন্দ্র, শশী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ সর্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। একদিন তাঁহারা স্থির করিলেন, বাগানের এক পাশে যে খেজুর গাছ আছে উহা হইতে সন্ধ্যাকালে জিরেনের রস খাইবেন। এই সম্বন্ধে ঠাকুরকে তাঁহারা কিছুই জানাইলেন না। সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহারা সকলে সেই গাছটীর দিকে চলিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন ঠাকুরের পথ্যাদি রন্ধনের জন্য সেই বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর তীর বেগে নীচে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া তিনি চমৎকৃতা ও চিন্তিতা হইয়া ভাবিলেন, "ইহা কি সম্ভব? যাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তিনি ইহা কিরূপে করিতে পারেন?" অথচ চাক্ষুষ দর্শন তিনি অবিশ্বাস করিতেও পারিলেন না। এই ঘটনার সত্যতা নিধারণের জন্য তিনি ঠাকুরের ঘরে গেলেন এবং দেখিলেন, "ঠাকুর বিছানায় নাই, কক্ষ শূন্য!" শ্রীমা সাবদা ভয়বিহ্বলা হইয়া চারি দিক খুঁজিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বকক্ষে যাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "একি ঘটনা ঘটিল!" কিছুক্ষণ এই ভাবে চিন্তাকুল থাকিবার পর সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঠাকুর পূর্ববৎ বিদ্যুদ্বেগে স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমা তখন ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে ঠাকুর বলিলেন, "তুমি দেখেছ নাকি?" তারপর বলিলেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে। সকলেই ছেলে মানুষ।

তারা আনন্দ করে বাগানের এক পাশে যে খেজুর গাছ আছে তার রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, ঐ গাছতলায় একটা কাল সাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে, সকলকেই কামড়ায়। ছেলেরা তা জানে না। তাই আমি অন্য পথে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। বলে এলাম, আর কখনো ঢুকিস্ নি।” শ্রীমা ইহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর শ্রীমাকে তখন ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয়, শিষ্যগণের প্রতি শ্রীগুরুর কী গভীর স্নেহ-মমতা ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন। তাঁহার দেহ কঙ্কালসার, এবং আহার নামমাত্র হইয়াছিল। ঠাকুরের এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মর্মাহত। তাঁহারা বুঝিলেন, শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনদেবতাকে হারাইবেন। ঠাকুরের গলদেশ হইতে প্রচুর রক্তপাত দেখিয়া ভক্তগণের খুব ভয় হইল; কিন্তু ঠাকুর পূর্ববৎ প্রফুল্ল ছিলেন। দৈহিক যন্ত্রণা যখন অতিশয় বাড়িত তিনি মৃদু হাস্যে অস্পষ্ট স্বরে গাহিতেন, ‘দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি সদানন্দে থেকো।’ অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা সত্বেও ভক্তগণের কল্যাণকামনায় তিনি উৎসুক থাকিতেন। উক্ত বৎসর ১৪ই মার্চ রাত্রিতে জাগ্রত অবস্থায় তিনি মহেন্দ্রনাথকে কাণে কাণে বলিলেন, “আমি এই সকল যন্ত্রণা সানন্দে সহ্য করছি। নচেৎ তোমরা কাঁদবে। তোমরা সকলে যদি বল যে, এই যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে দেহ যাক্, আমি রাজি।” ভোরের দিকে ডাক্তার উপেন্দ্র এবং কবিরাজ নবগোপালকে লইয়া গিরীশ ঘোষ আসিলেন। ঠাকুর একটু সুস্থ বোধ করিতেছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্তগণকে তিনি বলিলেন, “এই রোগ দেহের। প্রকৃতপক্ষে তাহাই।

আমি দেখছি, দেহটা ভৌতিক উপাদানে গঠিত।" গিরীশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখন ঈশ্বরের বহু রূপ দেখ্‌ছি। তন্মধ্যে এইটা (নিজের শরীর দেখাইয়া) একটা।"

পরদিন প্রাতে প্রায় আটটার সময় ঠাকুর একটু সুস্থ ছিলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, লাটু, মহেন্দ্র, বুড়ো গোপাল প্রভৃতি শিষ্যগণ বিষণ্ণচিত্তে মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিলেন, "জান, এখন কি দেখ্‌ছি? ঈশ্বর এই সব হয়েছেন! মানুষ ও পশুরা এক একটি চামড়ায়-মোড়া কাঠামো এবং তিনি প্রতি ঘটে বিরাজ করে মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ছেন, যেমন আমি একবার ভাবে দেখেছিলাম—বাগান, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, মানুষ ও পশু প্রভৃতি সব মোমে তৈরী, একই চিদ্বস্তুতে নির্মিত। আমি দেখছি, তিনিই ঘাতক, বধ্য ও ফাঁসীকাঠ।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। অল্পকাল পরে কিঞ্চিৎ বাহ্য জ্ঞান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "এখন আমার কোন যন্ত্রণা নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" লাটুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, লাটু হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছে। তা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন ঈশ্বর এভাবে বসে রয়েছেন।" ভক্তগণকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অসীম করুণায় বিগলিত হইলেন। মা যেমন শিশুকে আদর করে তেমনি তিনি রাখাল ও নরেন্দ্রের মুখে সস্নেহে হাত বুলাইলেন। একটু পরে মহেন্দ্রকে (নিজের শরীর দেখাইয়া) বলিলেন, "যদি এই শরীর আরো কিছু দিন থাকত, আরো অনেকের চৈতন্য হোত। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু ৺মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। পাছে লোকে আমার নিরক্ষরতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে আধ্যাত্মিকতার দুর্লভ সম্পদ আদায় করে নেয় তাই তিনি আমায়

সরিয়ে নিচ্ছেন। আর এই যুগে ভক্তিসাধন আদৌ আকাঙ্ক্ষিত নয়।"

রাখাল (কোমল ভাবে)—মাকে বলুন, যাতে আপনার শরীর আরো কিছু দিন থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁর ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—আপনার ইচ্ছা ও তাঁর ইচ্ছা তো এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু থামিয়া)—এতে কোন ফল হবে না। যখন আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিশে গেছে, তখন আমি কি করে তাঁর কাছে কিছু চাই ?

ভক্তগণ নীরবে উপবিষ্ট। ঠাকুর তাঁহাদের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন, "এখানে দুটি ব্যক্তি আছে—একটি মা, আর একটি তাঁর ভক্ত। ভক্তটিরই হাত ভেঙেছিল এবং সেই এখন অসুস্থ। বুঝলে ?" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ নির্বাক্। ঠাকুর আবার বলিলেন, "হায়! কাকেই বা এসব বলি; আর কেই বা বুঝে!" একটু নীরব থাকিয়া আবার তিনি বলিলেন, "তিনি তাঁর ভক্তগণ সহ মানুষরূপে, অবতার রূপে আসেন। ভক্তগণ পুনরায় তাঁর সঙ্গেই ফিরে যায়।"

রাখাল—আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একদল বাউল একটা বাড়ীর সামনে আসে, নাচে গায় এবং যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি চলে যায়। কোথায় যায়, কে জানে!

ঠাকুর এবং ভক্তগণ হাসিলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন, "যতদিন দেহ থাকে ততদিন দুঃখ অপরিহার্য। ভগবান্ ভক্তদের জন্যই

দেহ ধারণ করেন।" অনন্তর ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র কয়েকটি ভজন গাহিলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর ও রাখালের চক্ষে জল আসিল।

ঠাকুর যখন চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আছেন তখন একবার কয়েকটী ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। তাঁহারা যাইয়া দেখেন, ঠাকুর তথায় নাই এবং শুনিলেন, তিনি কাশীপুরে আছেন। তাঁহারা আনীত সেই সব মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ছবির সম্মুখে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ইহা যখন শ্রীমার কর্ণগোচর হইল তিনি ঠাকুরের অকল্যাণের ভয়ে চিন্তিতা হইলেন। শ্রীমাকে শঙ্কিতা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না। এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি, বাপান্ত দিব্যি!" শ্রীমা বলেন, "ঠাকুর 'আমি' 'আমার' কখনো বলিতেন না। সেদিন তাঁকে প্রথম 'আমার' বলতে শুনলাম।" ঈশ্বরাবতার ব্যতীত অন্যের পক্ষে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব।

যখন কোন চিকিৎসায় ঠাকুর আরোগ্য লাভ করিলেন না তখন সারদা দেবী এক অলৌকিক উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার দেবতুল্য পতির আরোগ্যের জন্য শিবের কৃপা লাভার্থ তিনি তারকেশ্বরে চলিলেন। যতক্ষণ না বাবা তারকেশ্বর তাঁহার প্রার্থনার উত্তর দিলেন ততক্ষণ তিনি অনাহারে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রার্থনারত রহিলেন। দ্বিতীয় রাত্রিতে তিনি কোন কিছু ভাঙ্গার শব্দে চমকিত হইলেন। তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্যের ভাব আসিল। তিনি ভাবিলেন, পার্থিব সম্বন্ধ অনিত্য এবং স্বপ্নমাত্র। তিনি উঠিয়া কাশীপুরে ফিরিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমার ধন্না দেবার ফল কি হোল?" সারদা দেবী সব বৃত্তান্ত

তাঁহাকে বলিলেন। ঠাকুর ইহাই আশা করিয়াছিলেন। শশী, লাটু প্রভৃতি ভক্তগণ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া ঠাকুরকে অন্তিম সময়ে প্রাণপণে সেবা করিয়াছিলেন।

একদিন বুড়ো গোপাল সন্ন্যাসিগণকে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষ মালা বিতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বালক শিষ্যগণকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন, "এদের চেয়ে ভাল সাধু আর কোথাও পাবে না। তোমার কাপড় ও মালা এদের দাও।" বুড়ো গোপাল এক পুঁটলী গেরুয়া কাপড় ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর তাঁহার এগারটি বালক শিষ্যকে এগার খানি গেরুয়া কাপড় দিয়া একখানি গিরিশের জন্য রাখিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি যুবক শিষ্যগণের দ্বারা একটি অনুষ্ঠান করাইয়া বর্ণনির্বিশেষে সকলের বাড়ী হইতে আহার্য গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে ঠাকুর নিজেই তাঁহার শিষ্যগণকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। কাশীপুরেই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সংঘের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬ই এপ্রিল ঠাকুর কিঞ্চিৎ সুস্থ ছিলেন। সেদিন গিরীশ আসিলেন। ঠাকুর গিরীশের জন্য লাটুর দ্বারা পান-তামাক ও জলখাবার আনাইলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহাকে কয়েকটি পুষ্পমালা দিয়াছিলেন। তিনি সেইগুলি একটির পর একটি স্বীয় গলায় পরিলেন এবং তন্মধ্যে দুইটি গিরীশকে দিলেন। তিনি বিছানায় শুইয়া গিরীশ, মহেন্দ্র এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহিত অস্ফুট স্বরে ভগবৎ প্রসঙ্গ করিলেন।

২২শে এপ্রিল সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে হীরানন্দ সৌকিরাম ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। এই সিন্ধী যুবক সিন্ধুদেশের দুইটি পত্রিকার সম্পাদক এবং কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তিনি

যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন তখন প্রায়ই ঠাকুরের নিকট আসিতেন। ঠাকুর তাঁহার সারল্য ও ভাবশুদ্ধির জন্য তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি আজ হীরানন্দকে দেখিয়া খুসী হইলেন এবং মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একে জান?" মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, 'হাঁ।' উভয়ের কথোপকথন শুনিতে ঠাকুরের ইচ্ছা হইল। কিন্তু মহেন্দ্র নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "হীরানন্দের সঙ্গে কথা বল।" নরেন্দ্র ও হীরানন্দের মধ্যে কথাবার্তা চলিল। হীরানন্দের অনুরোধে নরেন্দ্র শঙ্করাচার্যের 'কৌপীনপঞ্চক' আবৃত্তি করিলেন। উক্ত সংস্কৃত আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার নির্দেশে নরেন্দ্র 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়' এই উর্দু গজ‌্‌টি গাহিলেন। একটু পরে নরেন্দ্র 'অষ্টাবক্র সংহিতা'র কয়েকটি অদ্বৈতভাবাত্মক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবস্থ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল, যেন ভীষণ যন্ত্রণায় অস্পৃষ্ট! কয়েকটি ভক্ত তাঁহার জন্য ফুল এবং মালা আনিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি ফুল লইয়া স্বীয় মস্তক, কণ্ঠদেশ এবং হৃদয়াদি স্পর্শ করিয়া মহেন্দ্রের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নাড়ীর ঊর্ধ্বগতি হয়েছে, কতক্ষণ আগে জানি না। শিশুভাব আমার উপর ভর করেছে, আমি ফুলের সঙ্গে খেলা করছি। এখন কি দেখ্‌ছি জান? শরীরটা যেন কাপড়ে ঢাকা বাঁশের কাঠামো; এবং সেই কাঠামোটাই নড়ছে। এর ভিতর একজন আছেন বলে এটা নড়ছে। শাঁস ও বীচিগুলি চেঁছে নিলে লাউটা যেমন হয়, তেমনি হয়েছে আমার শরীরটা। ভিতরে কোন আসক্তি, কোন বাসনা বা কোন রিপু নাই। ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার, এবং—।

এই সব কথা বলিতে ঠাকুরের খুব কষ্ট হইতেছিল। মহেন্দ্র বলিলেন, 'আপনি অন্তরে সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে দেখছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে এবং বাইরে সর্বক্ষণ সচ্চিদানন্দকে দেখছি। দেখছি, সচ্চিদানন্দ এই দেহধারণ করেছেন এবং ভিতরে ও বাইরে ওতপ্রোত রয়েছেন। (একটু থামিয়া মহেন্দ্র ও হীরানন্দকে) আমি তোমাদের সকলকে আত্মীয় মনে করি। তোমাদের একজনকেও আগন্তুক মনে হয় না। আমি দেখছি, এক ঈশ্বরই বিভিন্ন রূপে লীলা করছেন। আরো দেখ্‌ছি, যখন মন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ব্যথা বোধ করি না। এখন দেখি, ব্রহ্ম যেন চর্মাবৃত হয়েছেন এবং এই গলার ঘা এর একপাশে পড়ে আছে। (একটু থামিয়া) চিৎ ও জড় কখনো কখনো পরস্পরের প্রকৃতি বিনিময় করে। যখন দেহ অসুস্থ হয় তখন আত্মা ভাবে সেও অসুস্থ।

হীরানন্দ (ঠাকুরকে)—আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল দেহই ভোগে, বুঝলে? দেহী আত্মা জরা ও ব্যাধির অতীত।

তৎপরে ঠাকুর ইঙ্গিত করিলেন যে, ভক্তগণের পাপ গ্রহণের জন্যই তাঁহার এই রোগ-যন্ত্রণা। ভাবাবস্থায় তিনি যাঁহাদিগকে স্পর্শ এবং কৃপা করিয়াছেন তাঁহাদের পাপভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

মে, জুন ও জুলাই মাসত্রয় অতীত হইল। ঠাকুরের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। ভক্তগণ বুঝিলেন, দেহযন্ত্রণা হইতে ঠাকুরের চরম নিষ্কৃতির দিন নিকটবর্তী। ভগ্ন হৃদয়ে তাঁহারা ঈশ্বরের অবশ্যম্ভাবী ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলেন। দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও

ঠাকুর লোককল্যাণ কার্য চালাইতে লাগিলেন। একদিন তিনি নরেন্দ্রকে রাম-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, "এই তোর ইষ্টমন্ত্র।" ইহার ফল হইল আশ্চর্যজনক। নরেন্দ্র দীক্ষান্তে অসীম আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। দিব্যানন্দের উন্মত্ততায় তিনি বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিনি এত ভাবস্থ ছিলেন যে, কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন না। নরেন্দ্রের এই ভাব কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী রহিল। ইহাতে অন্যান্য শিষ্যগণ ভীত হইয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন। ঠাকুর কেবল বলিলেন, "করুক্ না। সময়ে শান্ত হবে।" বৈকাল প্রায় চারটার সময় নরেন্দ্রের ভাবাবেগ হ্রাস পাইল।

নাগ মহাশয় ঠাকুরকে কাশীপুরে মাত্র কয়েকবার দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তথায় বেশী আসিতেন না। কারণ, ঠাকুরের অবর্ণনীয় রোগ-যন্ত্রণা তিনি দেখিতে পারিতেন না। এক দিন ঠাকুর তাঁহাকে স্বকক্ষে ঢুকিতে দেখিয়া বলিলেন, কাছে এসে বস। এই বলিয়া তিনি নাগ মহাশয়কে সস্নেহে কয়েক মিনিট যাবৎ জড়াইয়া ধরিলেন। আর একদিন তাঁহাকে শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখ দুর্গাচরণ, 'ডাক্তারেরা আমার আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি আমার আরোগ্যের জন্য কিছু করিতে পার?" নাগ মহাশয় ক্ষণকাল ভাবিয়া ঠাকুরের অসুখ স্বদেহে আকর্ষণ করিয়া লইতে সংকল্প করিলেন। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ প্রভো, আমি আপনার রোগারোগ্য করিতে পারি। আপনার কৃপায় আমি তা এই মুহূর্তে করতে পারি।" এই বলিয়া তিনি ঠাকুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। গুরু শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ জানি, তা তুমি পার।" ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের কিছুদিন

পূর্বে নাগ মহাশয় আসিয়া একদিন ঠাকুরকে বলিতে শুনিলেন, "আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বড় বিস্বাদ হয়ে গেছে।" কোন ভক্ত বলিলেন, "এখন ত আমলকীর সময় নয়।" একটী কথা না বলিয়া নাগ মহাশয় কলিকাতার পার্শ্ববর্তী বাগানগুলিতে আমলকীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। দুই দিন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় দিবসে তিনি দুই তিনটি আমলকী হাতে করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া ও আমলকী পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শ্রীমাকে নাগ মহাশয়ের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে বলিলেন। অন্ন প্রস্তুত হইলে ঠাকুর ইহার অগ্রভাগ গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া নাগ মহাশয়কে খাইতে দিলেন। 'মহাপ্রসাদ' 'মহাপ্রসাদ' বলিতে বলিতে গুরুভক্ত দুর্গাচরণ প্রসাদের সহিত কলা পাতাটী পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিলেন! প্রসাদে এরূপ বিশ্বাস ক্বচিৎ দেখা যায়। মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও ভক্তবৎসল ঠাকুর শিষ্যদের কল্যাণকামনা বিস্মৃত হইতেন না।

এই সময় একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "এখন যদি ইনি বলেন ইনি অবতার তাহলে আমার বিশ্বাস হয়।" গুরু শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ একাধারে সেই রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" মহাপ্রস্থানের আট নয় দিন পূর্বে ঠাকুর যোগীনকে বলিলেন, "পঁচিশে শ্রাবণের (৯ই আগষ্ট) পর হইতে দিনগুলি কেমন পাঁজি দেখিয়া বল।" যোগীন শ্রাবণের সংক্রান্তি পর্যন্ত দিনগুলি পঞ্জিকা দেখিয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর যোগীনকে পড়া বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহার চার পাঁচ দিন পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিলেন। তখন তাঁহার

ঘরে আর কেহ ছিলেন না। তিনি নরেন্দ্রকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্র অনুভব করিলেন, বৈদ্যুতিক আঘাতের মত এক সূক্ষ্ম শক্তি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। কতক্ষণ তিনি সেই অবস্থায় ছিলেন তাঁহার মনে নাই। তিনি বাহ্য সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর কাঁদিতেছেন! ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, "আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলাম। এই শক্তি সহায়ে তুমি জগতের অশেষ কল্যাণ করবে এবং তার পরে স্বধামে ফিরে যাবে।" এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হইল। এখন হইতে রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ একাত্মা হইলেন। গুরুশিষ্যের মিলনতীর্থ পুণ্যপ্রয়াগে যে অমৃত উদ্ভূত হইল তাহা জগৎবাসী পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। গুরুশক্তির প্রভাবে শিষ্য সমগ্র পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করিতে এবং বিশাল ভারতে সনাতন ধর্মের অভূতপূর্ব জাগরণ আনিতে সমর্থ হইলেন।

অবশেষে সেই স্মরণীয় দিন উপস্থিত হইল। ভক্তগণের পক্ষে সেই দিবস দারুণ দুঃখপূর্ণ। ৩১শে শ্রাবণ রবিবার (১৫ই আগষ্ট) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। সেদিন ঠাকুরের যন্ত্রণা ভীষণভাবে বাড়িয়া উঠিল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন, তাঁহার নাড়ীও অনিয়মিত হইল। অতুল নাড়ী পরীক্ষায় সুদক্ষ ছিলেন। তিনিই প্রথমে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন। তিনি সঙ্কট সময় সন্নিকট দেখিয়া সেবকগণকে সাবধান থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বে ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া সমবেত ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। যে আলোক তাঁহাদের হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিতেছিল তাহা নির্বাপিত হইবার

উপক্রম হইল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ধ্যায় ঠাকুর বলিলেন, তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তাঁহার জন্য সেবকগণ তরল পথ্য আনিলেন; কিন্তু উহার কিঞ্চিৎমাত্র ঠাকুর গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন। তাঁহারা তাঁহার মুখ ধোয়াইয়া সযত্নে তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় টানিয়া বালিশের উপর রাখিলেন। দুইটি সেবক তাঁহাকে হাওয়া করিতে ছিলেন। হঠাৎ ঠাকুর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার দেহ শক্ত হইয়া গেল। এই সমাধিতে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহা দেখিয়া অনুরক্ত সেবক শশী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। গিরীশ এবং রামচন্দ্রকে ডাকা হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিল। তখন তিনি বলিলেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত। তাঁহাকে ধরিয়া বসান হইল। তিনি অনায়াসে পুরা এক পেয়ালা পায়স খাইলেন। এমন অনায়াস আহার বহু দিন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি বলিলেন, তিনি বেশ আরাম বোধ করিতেছেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে একটু ঘুমাইতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে ঠাকুর স্পষ্টস্বরে তিন বার 'কালী'নাম উচ্চারণপূর্বক ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলেন। ঠাকুরকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র বিশ্রামার্থ নীচে যাইলেন।

হঠাৎ রাত্রি একটা দুই মিনিটের সময় ঠাকুর ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত ও চক্ষুদ্বয় নাসাগ্রে নিবদ্ধ, এবং মুখমণ্ডল দিব্য হাস্যে উদ্ভাসিত হইল। ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ইহাই তাঁহার মহাসমাধি। কারণ, এই সমাধি হইতে তিনি আর ব্যুত্থিত হন নাই। এইরূপে ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট সোমবার ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঠাকুর মর্ত্যধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। শিষ্য-ভক্তগণ ঠাকুরের

তিরোভাবে শোকাচ্ছন্ন হইলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এইভাবে স্বধামে প্রয়াণ করিলেন। যদিও রাত্রি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত ছিল তথাপি ভক্তগণের হৃদয় সমূহ শোকান্ধকারে সমাবৃত হইল। কয়েক মিনিট পূর্বে তাঁহাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান্ জগতে আর কেহ ছিলেন না; কিন্তু এখন তাঁহাদের মত ভাগ্যহীন পৃথিবীতে আর কেহ নাই! যতই তাঁহারা ঠাকুরের সৌম্য মুখের দিকে তাকাইলেন, ততই তাঁহারা শোকে দুঃখে মর্মাহত হইলেন। কে আর তাঁহাদের মনের সন্দেহ ও জীবনের সমস্যা দূর করিবেন? কে আর তাঁহাদিগকে দুঃখে কষ্টে এখন সান্ত্বনা দিবেন? তাহাদের এই অভাব চিরকাল অপূর্ণ থাকিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির বিষয় প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তবর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু নিম্নোক্ত প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন।*—"ক্রমে শ্রাবণ সংক্রান্তি সমাগত হইল। আজ রবিবার। বাগানে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। ডাক্তার আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "আজ আমার ভারি গা জ্বলছে। শিরায় শিরায় গরম জলের পিচকারি চলছে। ডাক্তার নতমুখ, নিরুত্তর। রাত্রি প্রায় প্রহরান্তে তাঁহার ক্ষুৎবোধ হইল। তাঁহার মুখে অতি সন্তর্পণে সুজীর পাত্র ধরা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে আহার করিলেন, অন্য দিন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে। ইহাই সংসারে তাঁহার শেষ আহার। তারপর বলিলেন, "ত্থাখ আমার হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।" হায়! কে বুঝিয়াছিল, তিনি তাঁহারই (তিরোভাব) মহোৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন!

---

*মাসিক বসুমতী, ফাল্গুণ, ১৩৪২ সালে প্রকাশিত।

সহসা স্তব্ধ কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তিন বার কালীনাম ধ্বনিত হইল—কালী, কালী, কালী! ভক্তগণ চকিত হইয়া উঠিলেন। একমাত্র ঠাকুরের কণ্ঠেই এমন সু-উচ্চ, সুস্পষ্ট, সুমধুর বুকভরা মনমাতান কালী নাম বাহির হইত! কিন্তু সেকণ্ঠ ত বহু দিন রবহীন। রামকৃষ্ণের মুখে 'কালী' নাম শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মৃত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুরের অধর যুগল অনৈসর্গিক হাস্যে রঞ্জিত, মুখে দিব্য দীপ্তি, কলেবর রোমাঞ্চিত, নয়ন নাসাগ্রে বদ্ধ, চোখে প্রেমধারা! শরীর রুগ্ন, শয্যায় পতিত, আত্মা কোন লোকে কে বলিবে? কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ সমাধি, এবং ইহাই মহাসমাধি।"

কিঞ্চিৎ পরে গিরীশ ও রাম আসিলেন। এই শোক-সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়িল। প্রাতে নানা স্থান হইতে বহু নরনারী ঠাকুরের দিব্য দেহের শেষদর্শন করিতে আসিলেন। কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বেলা আটটায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের দেহ শক্ত হইলেও উহাতে একটু উত্তাপ আছে। তিনি কিছুক্ষণ মেরুদণ্ড ঘসিয়া বলিলেন, "এখনো সব শেষ হয় নাই। ইহা গভীর সমাধি।" তিনি ভক্তগণকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিতে বলিলেন। প্রায় মধ্যাহ্নে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া দেহ পরীক্ষান্তে বলিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইল এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল আয়োজন চলিল।

প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি

সম্বন্ধে ভগিনী দেবমাতাকে বলিয়াছিলেন, * "যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন তখন কি তিনি কোন যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন ? অন্য পক্ষে আমার মনে হয়, উহাই ছিল তাঁহার জীবনের মধুরতম মুহূর্ত। কারণ তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ মহানন্দে পুলকিত ছিল। আমি স্বচক্ষে উহা দেখিয়াছি। তাঁহার দেহের প্রত্যেক লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এত অসুস্থতা সত্ত্বে কখনও প্রফুল্লতা হারান নাই। তিনি বলিতেন যে, তিনি ভাল ও সুখী আছেন ; কেবল (কণ্ঠদেশ দেখাইয়া) এখানে যেন কিছু হয়েছে ! সেই শেষ নিশিতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিলেন এবং নৈশ আহাররূপে আধ গ্রাস পায়স খাইলেন এবং যেন উহাতে কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁহার দেহে একটু উত্তাপ ছিল। সেইজন্য তিনি আমাদিগকে বাতাস করিতে বলিলেন। তদনুসারে আমরা প্রায় দশ জন একসঙ্গে তাঁহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলাম। ইহাতে তাঁহার সামান্য কাঁপুনি আসিল। তিনি দুই বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাঁপছ কেন ? তাঁহার মন এত স্থির ও দৃঢ় ছিল যে, অল্পতম কম্পনও তিনি অনুভব করিতে পারিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র) তাঁহার পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত জীবনের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে আলাপ করিলেন। তিনি বার বার নরেন্দ্রকে বলিলেন, "এই সকল বালকের ভার তোমাকে দিলাম। তুমি ইহাদের যত্ন লইও।" অনন্তর তিনি শয়ন করিতে চাহিলেন। রাত্রি একটার সময় তিনি পাশ ফিরিলেন

* বোষ্টনের 'মেসেজ অব দি ইষ্ট' নামক ইংরাজি মাসিকে প্রকাশিত এবং ১৯২৪ খ্রীঃ জুন মাসে মাদ্রাজের 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় উদ্ধৃত।

এবং তাঁহার গলায় ঘড় ঘড় শব্দ আরম্ভ হইল। তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত দেখিলাম। উক্ত দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে নরেন্দ্রনাথ বালিশের উপর ঠাকুরের পা দুটী রাখিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। একজন পরম ভক্ত ডাক্তার ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে! ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোকা, তুমি কি করছ? তুমি কি ভাবছ, ঠাকুব সত্যই আমাদিগকে ছেড়ে চলে গেছেন?" আমরা সকলে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ইহা তাঁহার সমাধিমাত্র, মহাসমাধি নহে। সেইজন্য একটু পরে নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন এবং আমরা প্রায় বিশ জনে মিলিয়া 'হরি ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। পরদিন বেলা একটা দুইটা পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিলাম। তখনও দেহে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ দেশে, একটু উত্তাপ ছিল; কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষান্তে বলিলেন যে, প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে। প্রায় পাঁচটায় দেহ শীতল হইয়া গেল এবং আমরা উহাকে একটা সুসজ্জিত খাটের উপর রাখিয়া শ্মশান-ঘাটে লইয়া গেলাম।

"শেষ দিনের প্রতিটি ঘটনা স্পষ্ট ভাবে আমার মনে আছে। সেদিন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিলেন। দূরাগত কোন ব্যক্তি সেদিন বৈকালে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে যোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করিলেন। একটু পরে আমি প্রায় সাত মাইল হাঁটিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, তিনি বাড়ীতে নাই এবং কিয়ৎ দূরে অন্য বাড়ীতে গিয়াছেন।

তাঁহার জন্য আর এক মাইল হাঁটিয়া আমি রাস্তায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু আমি তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিলাম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে একটী ঔষধ দিয়া বলিলেন, "এই ঔষধেই আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মাতাকে (কালীকে) একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কতদিন আর আমি এইরূপে উচ্ছিষ্ট খাইব?" আমরা সকলে মনে করিয়াছিলাম, তিনি সেদিন সুস্থ আছেন; কারণ তিনি অন্য দিন অপেক্ষা সেদিন কিঞ্চিৎ বেশী নৈশ আহার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আসন্ন প্রয়াণের কথা তিনি আমাদিগকে কিছুই বলিলেন না। বৈকালে তিনি যোগীনকে বলিলেন, "পাঁজি দেখে বল, আজ শুভ দিন কি না!" তবে তিনি কিছু দিন ধরিয়া আমাদিগকে বলিতেছিলেন, যে নৌকা সাগরে ভাসিতেছিল ইতোমধ্যে তাহার দুইয়ের তিন অংশ জলপূর্ণ হইয়াছে এবং শীঘ্রই বাকী অংশ জলপূর্ণ এবং নৌকা জলমগ্ন হইবে।" কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে, তিনি সত্যই চলে যাচ্ছেন।"

বৈকাল ৫টায় ঠাকুরের পূত দেহ নীচে আনিয়া একটি খাটের উপর রাখা হইল। পরে উহা গেরুয়া বস্ত্রে পরিহিত ও পুষ্প-চন্দনে শোভিত হইল। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান শোকসন্তপ্ত ভক্তগণের সহিত মৃতদেহের আলোকচিত্র গৃহীত হইল। এক ঘণ্টা পরে সেই দেহ কাশীপুর শ্মশানঘাটে সংকীর্তন সহযোগে আনীত হইল। শোভাযাত্রা দেখিয়া দর্শকগণ অশ্রু বিসর্জন করিলেন। দেহটি চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর স্থাপিত এবং অগ্নি-সংযুক্ত করা হইল। কাশীপুর শ্মশানে ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কয়েকটি সময়োপযোগী

সঙ্গীত গাহিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুরের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হইল। শিষ্য-ভক্ত-বন্ধুগণ ঠাকুরের নিত্য সান্নিধ্য হৃদয়ে অনুভবপূর্বক শ্মশান ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের নিকট ঠাকুর স্থূল দেহে যেমন সত্য বিদেহ অবস্থাতেও তেমনি সত্য। ভক্তগণ একটি তাম্রপাত্রে ঠাকুরের ভস্মাস্থি সংগ্রহ করিয়া কাশীপুর বাগানবাটীতে ফিরিলেন। তাঁহাদের মুখে ঘন ঘন 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি উচ্চারিত হইল। কাশীপুর শ্মশানের যে স্থলে ঠাকুরের পূত দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল তথায় একটী ক্ষুদ্র সমাধি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহার উপর লিখিত আছে—ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়। এই সমাধি মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া কাশীপুর শ্মশান পুণ্যতীর্থে পরিণত। দেশবিদেশের রামকৃষ্ণ ভক্তগণ এই তীর্থক্ষেত্রের পূতরজ স্পর্শ করিতে আসেন। কাশীপুর বাগান-বাটী বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিকৃত এবং রামকৃষ্ণ মঠে পরিণত হইয়াছে। তথায় ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ঠাকুর রামকৃষ্ণ কল্পতরু হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত দিন তথায় কল্পতরু মহোৎসব হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান প্রভৃতি বহু স্থানে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। কাশীপুর মঠে তাঁহার তিরোভাব উৎসব হয়; কিন্তু ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়াতে তাঁহার জন্মোৎসব সারা দেশে শত শত স্থানে এবং অন্যান্য দেশেও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

—

প্রথম পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত

এক

ভাঙ্গা কীর্তন—দাদ্‌রা

(কাল) মেঘ দেখে শিখি নাচে গো যেমন
সুন্দর পাখা তুলি।
নাচগো আমার মনের ময়ূরী
শ্রীরামকৃষ্ণ বলি॥

প্রেম-অঞ্জন আঁখিতে মাখিয়া
নাচ আনন্দে আপনি মাতিয়া।
রামকৃষ্ণ নাম গাহিয়া গাহিয়া
আপনারে যাও ভুলি॥

অনুরাগ-ফাগে হিয়া রাঙ্গাইয়া
কামনা-কঙ্কণ পরি।
হৃদি-মন্দিরে প্রাণের ঠাকুরে
বসাবি যতন করি॥

বলিবি গো প্রভু ও রাঙ্গা চরণ
কত আশা করে লইনু শরণ।
নহি আর আমি, সব তুঁহু স্বামী
লহ মোরে আজ অঞ্জলি॥

দুই

ভজন—কাহারবা

নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম।
এস রামকৃষ্ণ মোর নয়নাভিরাম॥
এস যশোদা-দুলাল, তুমি রঘুপতিরাম॥
দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কিবা মনোহর।
কভু শ্যামারূপ ধর, কভু সাজ শঙ্কর॥
শ্রীরাধার ভাবে কভু কাঁদে তব অন্তর।
ধুলায় লুটায়ে বল কভু নবঘন শ্যাম॥
পঞ্চবটীর মূলে জাহ্নবী কিনারায়।
যেচে প্রেম বিলাইতে ডাক ওরে আয় আয়॥
ভকত-কুসুম যত আনিলে আপন সাথ।
নন্দন কাননের সুন্দর পারিজাত॥
সে কুসুমে ভরি সাজি আপনি পূজারী সাজি
করিলে আপন পূজা ধরি মুখে নিজ নাম॥

তিন

ভজন—কাহারবা

প্রাণের দেবতা মোর রামকৃষ্ণজী
জনম মরণেরি সাথী।
করুণা-ঘনরূপ মম হৃদি-মন্দিরে
নিরখি গো যেন দিন-রাতি॥

রামকৃষ্ণ নামে মম মন চঞ্চল।
পাখা তুলি শিখি সম নাচে যেন অবিরল॥
নৃত্যের বশে হবে বিবশ রিপুদল
রহিবে প্রেমেতে হিয়া মাতি॥
কাঙ্গালের অনুরাগে সেজেছ নিজে কাঙ্গাল।
বিশ্বের ব্যথা-বিষ পিও যেন মহাকাল॥
আমিও কাঙ্গাল তব করুণার ভিখারী
বড় দুখী আমি ওগো দুখতাপহারী।
ক্ষমা কর অপরাধ মিনতি আমারি॥
এ দীন দুখীর লহ প্রণতি॥

চার

মিশ্র—দাদ্‌রা

রামকৃষ্ণ নামের নূপুর
ঝুমুর ঝুমুর বাজে মনে।
সেই ধ্বনিতে জাগবে স্বপন
প্রভুর চরণ মোর ধ্যানে॥
নূপুর যেমন জাগায় স্মরণ
প্রভুর রাঙ্গা কোমল চরণ।
তেমনি রামকৃষ্ণ কমল
ফুটবে মন-কমল-বনে॥

নামের অমল পরশ প্রাণে
সোণার কাঠি দেয় বুলিয়ে
ঘুম-পরীরা হারায় দিশা
ইসারাতে যায় পালিয়ে ॥
এ কস্তুরী ফুটলে পরে
মন-হরিণী পুলক-ভরে
খোজে কোথায় সুবাস সে যে
অন্তরেতে রয় গোপনে ॥

পাঁচ

ভৈরবী—দাদ্‌রা

রামকৃষ্ণ বলরে কণ্ঠ রামকৃষ্ণ বল।
রামকৃষ্ণানন্দে রহ মত্ত অবিরল ॥
এই যুগেরি জাগ্রত রে দীনেরি সম্বল।
(এই) শঙ্কাহারী নাম নিলে তোর আসবে প্রাণে বল ॥
পরম ইষ্ট পরম সাথী
নাম যে ভবের ভেলা।
সম্পদে বিপদে এ নাম
না করিহ হেলা রে মন, না করিহ হেলা ॥
ঐ চরণে নিলে শরণ
ভয়ে মরে আপনি মরণ
রামকৃষ্ণ-প্রেমেতে মন
হওরে হও উতল ॥

ছয়

আড়ানা—কাওয়ালী

ভিন্ন নহে ত রামকৃষ্ণ কালী।
তা জেনে ভকতরাজ গিরীশ শ্রীচরণে
ঢালিল শ্যামার যত পূজার ডালি ॥
বহুরূপী পূজারীর লীলা-খেলা অপরূপ
শ্যামাপূজা রজনীতে প্রকাশিলা নিজরূপ।
কে পূজে কাহারে দুঁহু মিলে হল একরূপ
যে বুঝিল পদে দিল কুসুমাঞ্জলি ॥
সেদিনের স্মৃতি-কথা নহে ত স্বপন।
শ্যামপুকুরে ঝুরে সে গৃহ অঙ্গণ ॥
আজো বুঝি লীলাময় এই পুণ্য দিনে।
সাথী লয়ে সেথা লীলা করিছে গোপনে ॥
পূত লীলা হেরি মন কল্পনা-নয়নে
জয় রামকৃষ্ণ বলি দাও করতালি ॥

সাত

ভাটিয়ালী—দাদ্‌রা

কাঁদরে আমার ও ভোলা মন
কাঁদরে রামকৃষ্ণ বলে।
কাঁদন-সিদ্ধ ঠাকুর আমার
যদি ভোলে অশ্রুজলে ॥

যাদের তরে কাঁদিস্ রে মন

তারা ত তোর নয়ক আপন।

এই যে ধরা স্বার্থে ভরা

মনের মানুষ কই বা মেলে॥

আমি যে তোর বাহন রে মন

মালিক শ্রীরামকৃষ্ণ।

তার চরণে কাতর প্রাণে

দুখ জানা সতৃষ্ণ॥

কয় সাধু নাগ মন্ত্রে মাতাল

"বাবার চেয়ে মা যে দয়াল গো"।

তুই মা বলে ডাক মার খুসীতে

যদি প্রভুর পরাণ গলে॥

আট

মিশ্র—কাহারবা

নমামি শ্রীভাগবত, ভক্ত, শ্রীভগবান্।

তিনে এক একে তিন জেনে গাহ জয় গান॥

এ তিনের মহিমা-গীতি

এক মনে গাহ নিতি

কারো কথা শুনো নাক

মনে নাহি ভাব আন॥

ধরণীতে এই তিনে
সম্পদ যে বা জানে
সেই ত বুঝেছে সার
নমি তাঁরি শ্রীচরণে ॥

আমার মনের আশ
হব এ তিনের দাস
তাই রামকৃষ্ণ-পদে
সঁপেছি এ মন প্রাণ ॥

নয়

ভৈরবী—কাহারবা

ভগবান যুগে যুগে মানব প্রতিমায়।
যেচে আসি দেয় ধরা সে অসীম এ সীমায় ॥

চরণ-রেখায় আঁকা লীলা-আলপনায়
মানব যতনে রাখে অতনুর আঙ্গিনায়।

মুক্ত বিহঙ্গম পিঞ্জরে করুণায়
সরগের দেববাণী গুঞ্জরি শুনায় ॥

সাথী হয়ে যারা করে এ লীলার অভিনয়।
ইসারায় তাদেরি সে দেয় নিজ পরিচয় ॥

মঞ্চের যবনিকা তার এই বাতায়ন
নায়কেরে দেখিবারে যেন শুধু এ নয়ন।
এত আয়োজন তবু কে তারে দেখিতে চায়
ফণায় মণির শোভা ফণী কি তা দেখে হায়॥

দশ

ভাঙ্গা কীর্তন—একতালা

দ্বিতীয়ার চাঁদ শ্রীরামকৃষ্ণ
এসগো হৃদয়-গগনে।
দিনে দিনে তুমি বাড়িবে সেথায়
হেরিব নিতি নিরজনে॥

হৃদি-নহবতে স্পন্দনরূপে
রাজিছেন মোর জননী।
পঞ্চভূতে যে রচিল হেথায়
পঞ্চবটীর বনানী॥

সুর-সুরধনী জাহ্নবী হেথা
বহিছে নীরবে গোপনে।
তারি তরঙ্গে শত চাঁদ হয়ে
ভাতিবে শয়নে জাগরণে

তোমারি প্রভায় নিরখি তোমায়
নন্দিত হবে হিয়া।
চির-ঘুমন্ত মন-শতদল
জাগিবে পুলকে মাতিয়া॥

কত আর রব শবরীর মত
আশাপথ পানে চাহিয়া।
কাঁচ কুড়াইতে মাণিকের লোভে
জাগিবে পুলকে মাতিয়া॥

পথেরি বারতা সে মণি-গেহের
শ্রীগুরু দিলেন যতনে।
সে পথে যে হায় মন নাহি ধায়
তাই স্মরি রাঙ্গা চরণে॥

———

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বালীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের মূলকেন্দ্র অবস্থিত হইলেও ঠাকুর কখনো উক্ত গ্রামে পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু বেলুড়ের সীমান্তে বালীতে তিনি আসিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে। বালীতে দাদের রাসবাড়ীর পশ্চিমে যে টেম্পল রোড আছে উহার উত্তর ধারে সান্ন্যালদের বাড়ীতে তিনি আগমন করেন। তখন টেম্পল রোড ছিল না এবং উক্ত বাড়ীর উত্তর দিক দিয়া যাতায়াতের পথ ছিল। সেই পথে কল্যাণেশ্বর শিব দর্শনান্তে তিনি উক্ত বাড়ীতে পদার্পণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৩।৮৪ খ্রীঃ উক্ত ঘটনা ঘটে। বেলুড় মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কল্যাণেশ্বর শিব দর্শনে আসিয়াছিলেন এবং জাগ্রত শিবের মাথা হইতে ফুল পড়িয়া যাইতে দেখেন। কিন্তু উহার বিস্তৃত বিবরণ অদ্যাপি অপ্রাপ্য। পরন্তু আলোচ্য স্মরণীয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত সান্ন্যালদের বংশে শশীভূষণ সান্ন্যাল নামে এক প্রসিদ্ধ পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার সন্তানগণ অদ্যাপি বর্তমান। তিনি কিছুকাল সংসার করিবার পরে ব্রহ্মচারী হন ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র প্রথম ভাগে প্রদত্ত 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃতে' তিনি 'বালীর শশী ব্রহ্মচারী' নামে উল্লিখিত। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও আয়ুর্বেদ-চিকিৎসায় সুনিপুণ ছিলেন। তৎপ্রণীত 'আর্য্য শাস্ত্রপ্রদীপ', 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা', 'দুর্গা, দুর্গোৎসব ও নবরাত্রতত্ত্ব' এবং 'শ্রীরামাবতার কথা' প্রভৃতি বহু বাংলা গ্রন্থ ছিল। 'রামাবতার কথা' পুস্তকের হিন্দি অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিব্রাজক রূপে যখন স্বামী বিবেকানন্দ কাশীধামে

অবস্থান করেন তখন তিনি যোগত্রয়ানন্দজীর নিকট কিছুকাল বেদান্ত আলোচনা করেন। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর উপর্যুক্ত রাসবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব করেন। সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে উহার কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণ উৎসব করিতে দেন নাই। রাসবাড়ীতে অনুষ্ঠিত উৎসবে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ এখনো জীবিত।

স্বামী যোগত্রয়ানন্দ সরস্বতীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বড়ই ভালবাসিতেন এবং অধিক দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে চিত্তে ক্লেশ অনুভব করিতেন। তখন যোগত্রয়ানন্দজী প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন। তিনি চিকিৎসা করেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে চিকিৎসা-বৃত্তির হেয়ত্ব বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে সমাগত ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে স্বামী যোগত্রয়ানন্দ পরমহংসদেবের চরণদ্বয় ধরিয়া নিবেদন করিলেন, "একবার আপনার পা দুখানি আমার বুকে দিন।" তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি তো চিকিৎসা কর।" এই কথা শুনিয়া অভিমানী যোগত্রয়ানন্দজী কিঞ্চিৎ আহত হইলেন এবং ভাবিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্পর্শ করা ত আমায় উচিত হয় নাই। ইহার পর কিছুদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যান নাই। পুনরায় তিনি যেদিন গেলেন সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিলেন, "দেখ, ভালবাসা হয়, আবার থাকে না।" যোগত্রয়ানন্দজী বুঝিলেন, কিছুদিন না আসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে এই মৃদু তিরস্কার করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, তোমাদের ওখানে কল্যাণেশ্বর তলায় আমি একবার যেতে চাই। কি রকম করে গেলে সুবিধা হয়?" ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝিয়া সকলে যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন। একখানি নৌকা করিয়া গঙ্গার পরপারে আসা হইল। নৌকা হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগত্রয়ানন্দজী প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে কীর্তনাদি করিতে করিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইলে ঠাকুর

যোগত্রয়ানন্দজীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কত দূর? চল না, তোমাদের বাড়ীটা একবার দেখে যাই। কোন দিক্ দিয়ে যেতে হয়?" ঠাকুরের প্রস্তাবে যোগত্রয়ানন্দজী যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া উত্তর দিলেন, "ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? আমরা আজ কৃতার্থ হইব। চলুন, নৌকা করিয়াই যাওয়া যাক্; তাহাতেই সুবিধা হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "না, এখন আমার নেশা হইয়াছে। চল, হেঁটেই যাই।" ঠাকুরের আগ্রহে সকলে পদব্রজে তাঁহার সঙ্গে রাসবাড়ীর সমীপে সান্ন্যালদের বাড়ীতে আসিলেন। ইতোমধ্যে যোগত্রয়ানন্দজীর অনুজ প্রভৃতি পূর্ব হইতে আসিয়া ঠাকুরের বসিবার স্থান ও আসনাদির ব্যবস্থা এবং তাঁহার সেবার জন্য কিছু ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ঠাকুর পা ধুইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে যোগত্রয়ানন্দজী তাঁহার অনুজকে ফলমূলাদি ঠাকুরকে নিবেদন করিতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন, "তা দাও না, দাও নাগো।" যোগত্রয়ানন্দজী স্বয়ং অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তা তুমিই দাও না গো।" তাহাতে যোগত্রয়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দিব? তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হ্যাগো, তোমার হাত থেকেই ত নেব। সেইজন্যই তো এসেছি গো।" ইহাতে যোগত্রয়ানন্দজী স্বহস্তে ঠাকুরকে ফলাদি নিবেদন করিলেন। ঠাকুর তা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ সমবেত সকলকে বিতরণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দ্যাখ, তোরা তো আমাকে এই খাওয়ালি। আচ্ছা, এখন আমার সঙ্গে ফিরে চল। আমি তোদের বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াব; মিথ্যা নয়, সত্যই খাওয়াব। বাগবাজারের রসগোল্লা দুই হাঁড়ি এখন আমার জন্য দুইজন নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে এক হাঁড়ি এনেছে এক বেশ্যা। তা থেকে তোকে দেব না। আর এক হাঁড়ি যে এনেছে সে শুদ্ধভাবে এনেছে, সে ভক্ত। তা থেকেই তোকে দেব।"

পুনরায় সকলে নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সকলে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ

যেরূপ বলিয়াছিলেন সেরূপ দুই হাঁড়ি রসগোল্লা কথিত প্রকার ব্যক্তিদ্বয়ই আনিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব রসগোল্লা সমবেত ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় যোগত্রয়ানন্দজী ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত সাগ্রামপুরে গিয়াছিলেন। যে রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব ঘটে সেই রাত্রে তিনি নিম্নলিখিত স্বপ্ন দেখেন। তিনি তাঁহার বন্ধু প্রতিবেশী বালী-নিবাসী শশিভূষণ ঘোষের সহিত কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। দ্বারবান্ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাহারা উভয়ে বহির্দেশে দণ্ডায়মান আছেন। একটু পরে ঠাকুর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ওরা আমার লোক।" তৎপরে যোগত্রয়ানন্দজীর নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, শশী, এসেছিস্, আয়। আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম; নইলে এত ক্ষণে চলে যেতাম।" যোগত্রয়ানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমি এখানে আর থাকবো না, এবার শরীরটা ছেড়ে দেবো।" ইহা শুনিয়া যোগত্রয়ানন্দজী কাঁদিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'কাঁদিস্ না। আমার কাছে কিছু প্রার্থনা কর।" তখন যোগত্রয়ানন্দজী নিবেদন করিলেন, "আপনার চরণে অটল অচল ভক্তি দিন। আমি কেবল ইহাই চাই; আর কিছু চাই না।" "তোর মুখে এই প্রার্থনাই সাজে" এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রিয় ভক্তকে কোলে তুলিয়া লইলেন। উক্ত স্বপ্ন দর্শনের দুই এক দিন পরে যোগত্রয়ানন্দজী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু শশিভূষণ ঘোষের পত্র পাইয়া জানিলেন, "ঠিক সেই রাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং ইহার কিছু পূর্বে যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যান তখন ঠাকুর তাঁহাকে যোগত্রয়ানন্দজীর কথা জিজ্ঞাসা করেন।" *

---

* এখনালুপ্ত 'উৎসব' মাসিকে ১৩৪২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় এই ঘটনা প্রকাশিত।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা*

ফাল্গুন মাসে পশ্চিম বঙ্গে দুই দেব-মানব অবতীর্ণ হন—ফাল্গুনী দ্বিতীয়ায় পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য দেবের অন্তর্ধানের প্রায় তিন শতক পরে আসিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য ভূমিষ্ঠ হন এবং হুগলী জেলার মধ্যবর্তী কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর। নবদ্বীপ ও দক্ষিণেশ্বর উভয়ই গঙ্গাতীরবর্তী। ভাগীরথীর পুণ্যস্রোতের সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী হিন্দুত্বের জননী ও ধাত্রী।

শ্রীচৈতন্য তের মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্রগ্রহণ-কালে রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হন। নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আকাশস্থ কলঙ্কী পূর্ণচন্দ্রও রাহুর কবলে মুখ লুকাইয়াছিল। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে চারি দিক হরিনামে মুখরিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু যে হরিনামে বাংলা দেশ মাতাইলেন সেই হরিনামের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকাল ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেড় ঘণ্টা সময় ঈশ্বরচিন্তার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। তখন সাধুগণ এবং ভক্তবৃন্দ ইষ্টধ্যানে ও শাস্ত্রপাঠে মগ্ন থাকেন। সেই শুভ লগ্নেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধরাধামে আসিলেন। আধুনিক মানব মনকে ধর্ম্মমুখী করিবার জন্যই তাঁহার আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি। ক্ষুদিরাম সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। চন্দ্রমণি অতিশয় স্নেহশীলা ও ভক্তিমতী। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বনাম গদাধর। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বনাম বিশ্বম্ভর। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। তাঁহাদের বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টে। শচীদেবী বিশ্বম্ভরকে

*পুরুষোত্তমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৩৫৯ সালের ৯ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীচৈতন্য স্মৃতি-সভায় পঠিত এবং 'পাঞ্চজন্য' মাসিকের ১৩৫৯ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়। কারণ, অবতারত্বই অলৌকিক, ইহা প্রাকৃত বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে।

অসাধারণ স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও গদাধর 'চালকলা বাঁধা বিদ্যা' শিখিলেন না। পাঠশালায় তাঁহার শুভঙ্করী ধাঁধা লাগিত। শ্রুতিধর বালক একবার যাত্রাগান বা কথকতা শুনিয়া সব মনে রাখিতে পারিতেন। বর্তমান যুগের বিদ্যা-কৌলিন্যের প্রতিবাদকল্পে তিনি নিরক্ষর রহিলেন। অপরা বিদ্যায় অমনোযোগী হইলেও পরাবিদ্যায় তিনি পারদর্শী হইলেন। বাল্যকালেই তাঁহার ভাব-সমাধি হইত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য সর্বশাস্ত্রবিৎ মহাবিদ্বান্ ছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে স্বীয় গৃহে চতুষ্পাঠী খুলিলেন। শোনা যায়, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটী মৌলিক টীকাও লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সহপাঠী রঘুনাথের টীকা অচল হইবে ভাবিয়া তিনি ইহা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেন। তখন কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎকর্তৃক পরাজিত হন। পুরীবাসী মহাপণ্ডিত সার্বভৌমও শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যে তাঁহার পদানত হন। সার্ব্বভৌম যে ভাগবতোক্ত শ্লোকের ৮।১০টী ব্যাখ্যা করেন শ্রীচৈতন্য উহার ১৮।২০ প্রকার অর্থ করেন। তখন শ্রীচৈতন্যের পদতলে পড়িয়া সার্ব্বভৌম এই স্তব করেন :—

উজ্জলবরণং গৌরবরদেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপয়ালেশং
তং প্রণমামি শ্রীশচী-তনয়ং॥

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির জামাই মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপ, কাশী, বৈদ্যনাথ, অযোধ্যা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। নবদ্বীপে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় শ্রীরামকৃষ্ণ গৌর-নিতাইর দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হন। তৎদৃষ্ট উভয় মূর্তি তাঁহার দেহে বিলীন হইলেন। শিহড়ে অবস্থান কালেও তাঁহার অনুরূপ অনুভূতি হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া মহাসাধিকা

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন, এবার গৌর-নিতাই একাধারে অবতীর্ণ। কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে দেখিলেন, বাবা বিশ্বনাথ বিমৃত মানুষের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম শোনাইয়া মুক্তি দিতেছেন। শাস্ত্রে আছে, ভারতের সাতটী মোক্ষধামের মধ্যে কাশী অন্যতম। কাশীধামে পাপী মরিলেও মুক্তি লাভ করে। শ্রীচৈতন্য ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইতে প্রায় ছয় বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়ে রণছোড়জীর মন্দির দর্শন করি। তথায় সমবেত ভক্তবৃন্দকে খোল ও করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে দেখিলাম এবং গুজরাটের ইতিহাস পড়িয়া জানিলাম, ১৫১৫ খৃঃ শ্রীচৈতন্য জুনাগড়ে যাইয়া যে সংকীর্ত্তন প্রবর্তন করেন তাহা অদ্যবধি চলিয়া আসিতেছে। কাশীতে তিনি বেদান্তী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে ভক্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তখন বৃন্দাবন জঙ্গলাকীর্ণ ও লুপ্তপ্রায় ছিল। তিনিই বৃন্দাবন তীর্থকে পুনরুদ্ধার করিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ আঠার বৎসর পুরীধামে সমুদ্রতীরে গম্ভীরাতে অতিবাহিত হয়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তথায় ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব ঘটে; কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মীরাবাই, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষদের মৃতদেহের সন্ধানও ইতিহাস দিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ৫১ বৎসর বয়সে কলিকাতার সমীপবর্তী কাশীপুরে একটী বাগানবাড়ীতে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে কাশীপুর শ্মশানে ভস্মীভূত হয়। তথায় তাঁহার নামে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী রাণী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বৎসর হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় অবস্থান করেন। কালীবাড়ীতে যে কক্ষে তিনি থাকিতেন তাহা অদ্যাপি সুরক্ষিত। ২৪।২৫ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ জয়রামবাটী গ্রামবাসী শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণি দেবীর সহিত পরিণীত হন। ১৮৭৩ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী সারদামণিকে

সাক্ষাৎ কালীমাতা জ্ঞানে পূজা করেন। এই ঘটনা ধর্ম জগতে অদ্বিতীয়। সেই দিন হইতে তিনি স্বপত্নীকে জীবন্ত দেবীমূর্তিরূপে দেখিতেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, নারীমূর্তি জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা সত্য সত্যই অনুভব করিলেন। তিনি সারদামণিকে বলিয়াছিলেন, যিনি কালীমন্দিরে বিরাজিতা তুমি তাঁহারই প্রতিমূর্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, পতি পত্নীর প্রিয় হয় বা পত্নী পতির প্রিয় হয় উভয়ের মধ্যে একমেব পরমাত্মা অবস্থিত বলিয়া। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কোন দৈহিক সম্পর্ক রাখেন নাই। শ্রীচৈতন্য প্রথমে বল্লভচার্য্যের সুকন্যা শৈশব-সঙ্গিনী লক্ষ্মী দেবীর সহিত বিবাহিত হন; কিন্তু লক্ষ্মী দেবী অকালে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শ্রীচৈতন্য সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সারদামণির ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁহার দেব-পতির তিরোভাবের পর কিছুকাল জীবিত ছিলেন। ১৫০৯ খৃঃ পঁচিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুদত্ত সন্ন্যাস-নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্য নামেই সমধিক পরিচিত। গঙ্গা ও অজয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে যথায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তথায় তাঁহার স্মৃতি-মন্দির অদ্যাপি অবস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি ব্রহ্মধ্যানে তিন দিন বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য ছিলেন। যে ক্ষুদ্র কুটীরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহা অধুনা পঞ্চবটীতলায় বর্ত্তমান।

শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী। গয়াধামে ভক্তবীর ঈশ্বরপুরী থাকিতেন। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং তাঁহার জন্মস্থান ছিল হালিসহরে। শ্রীচৈতন্যের সাধন-জীবন নাই বলিলেই চলে। ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইলেন। তিনি শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণ-বিরহে সারা জীবন উন্মত্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত' বলা হয়। তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ ভাগবতোক্ত কৃষ্ণাত্মিকা গোপীকাদের কৃষ্ণ-বিরহবৎ মর্মদাহী। স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে তিনি বলিয়াছেন, "গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট নিমেষ

যুগায়িত, চক্ষুদ্বয় প্রাবৃষায়িত এবং সর্ব্ব জগৎ শূন্যায়িত বোধ হইতেছে।" শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণও মধুর ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। তখন শ্রীরাধার ভাবে তিনি এত অভিভূত থাকিতেন যে, তিনি নিজেকে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যবৎ শ্রীরাধা বলিয়া ভাবিতেন এবং নারীদের মত প্রত্যেক মাসে তাঁহার স্বাধিষ্ঠান চক্র হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হইত। ভাগবত ভাবাতিশয্যে এইরূপ দৈহিক পরিবর্ত্তন বিশ্বেতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর তখন ঊনিশ প্রকার ভক্তি ভাবের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। সাধনান্তে তিনি প্রথমে শ্রীরাধা ও পরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। সীতারাম ভাব সাধন কালে তিনি এত হনুমদ্ভাবে ভাবিত হন যে, তাঁহার মেরুদণ্ডের নিম্ন ভাগ লাঙ্গুলবৎ কিঞ্চিৎ বাড়িয়া যায়। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ বৈষ্ণব, তান্ত্রিক ও বেদান্ত সাধনে সিদ্ধ হন। কোন সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে তিনি তিন দিনের অধিক সময় নেন নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে এইভাবে প্রণতি জানাইয়াছেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।
তোমার ধেয়ানে মিলিত হয়েছে তারা॥
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে।
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে॥
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় প্রচার করেন ও বলেন, 'যত মত তত পথ।' মহাত্মা গান্ধী বলেন "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী ধর্ম্মসাধনার অপূর্ব্ব ইতিহাস।" ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেন, "ত্রিশ কোটী হিন্দু নরনারী গত ত্রিশ শতক যাবৎ যে ধর্ম্মসাধনা করিয়াছে তাহার প্রাণবন্ত প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ।" সমন্বয়াদর্শ বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন। সেইজন্য যুগদেবতার জীবনে তাহাই বিমূর্ত্ত হইল। শ্রীচৈতন্য আসিলেন মধ্যযুগে। তৎকালের প্রয়োজন ছিল ভক্তিধর্ম্ম। তাই তিনি অনর্পিতচরী

ভক্তি প্রচার করিলেন এবং ভক্তিকে মুক্তির উপরে স্থান দিলেন। চৈতন্যোক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিসাধন এইরূপ—

সৎসঙ্গ সাধুসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥

মধ্যযুগে যে ভক্তি-বন্যা উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয় তাহার অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে শ্রীচৈতন্য নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

বাংলার নবাব হোসেন শাহ স্বীয় উজীর সুবুদ্ধি রায়ের মুখে থুতু ফেলিয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করেন। সুবুদ্ধি রায় কাশীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ ভিক্ষা করেন। সংকীর্ণমনা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পরামর্শ দেন, গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করুন। যে প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগের বিধান দেয় তাহার প্রয়োজন আছে কি? সুবুদ্ধি রায় প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইলেন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নামে তুমি কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥

একটি ভক্তিগ্রন্থে আছে, একবার হরিনাম উচ্চারণে যত পাপ নষ্ট হয় তত পাপ কোন পাতকী করিতে পারে না। কি অভয় বাণী। কলিযুগে হরিনামই ভক্তি ও মুক্তি দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে আছে, দোষ-নিধি কলিযুগের মহাগুণ এই যে, নামজপেই মুক্তিলাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তিনি বলিতেন, "সকাল সন্ধ্যা হাততালি দিয়া হরিনাম করিবে। গাছের তলায় হাততালি দিলে যেমন শাখাস্থিত পাখীসব উড়িয়া যায় তেমনি হাততালি দিয়া সকাল সন্ধ্যা ভগবানের নাম করিলে দেহ-বৃক্ষের সব পাপ-পাখী পলায়ন করে।"

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভগবান ধর্ম্মস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যে ঈশ্বর মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যরূপে আসিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে মাতৃভাবের সাধন ও প্রচার করিলেন। তিনি সর্বধর্ম

সাধন করিলেও ভগবানকে মধুর মাতৃনামে ডাকিতেন। শিশু স্বীয়, জননীকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেই মা আসিয়া সন্তানকে কোলে করেন। মাতৃ-নাম এই যুগের মহামন্ত্র। ভগবানকে 'মা' বলিয়া ডাকিলে তিনি খুব আপনার হইয়া পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "বাদশাহী আমলের টাকা যেমন ব্রিটিশ আমলে চলে না তেমনি পূর্ব যুগের সাধনা এ যুগে অচল। এ যুগে ভগবান মাতৃ সম্বোধনে সহজে সন্তুষ্ট হন।" আসুন, আমরা বর্তমান যুগ-দেবতার উপদেশে জগদম্বাকে আমাদের জননী জ্ঞানে ভাবি এবং 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ধন্য হই।

চতুর্থ পরিশিষ্ট

নাটশালে স্বামী প্রেমানন্দ *

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর স্বামী প্রেমানন্দ ভক্তের আহ্বানে এবং ঠাকুরের নির্দেশে মেদিনীপুর জেলার গণ্ডগ্রাম নাটশালে যাইয়া ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করেন। সম্প্রতি উক্ত অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে যাইয়া স্বকর্ণে লোকমুখে এই সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম তাহা বর্ণনাতীত। কয়েকটী প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত অদ্যাপি জীবিত। তাঁহাদের স্মৃতি-পটে সেই দিব্য ঘটনা আদৌ অস্পষ্ট হয় নাই। মহাপুরুষের কার্য্যাবলী বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায় না।

নাটশাল তমলুক মহকুমার অন্তর্গত এবং রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। ইহার একপ্রান্ত গেঁওখালি। কলিকাতা হইতে গেঁওখালি জাহাজে যাওয়া যায় পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে। দামোদর, হুগলী ও রূপনারায়ণ নদীত্রয়ের মোহানা

* পাঞ্চজন্য চৈত্র ১৩৫৯ সাল।

গেঁওখালির সম্মুখে। উক্ত মোহানা সাগরবৎ বিশাল ও সুদৃশ্য এবং মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলাত্রয়ের মিলন-ভূমি। এইখানেই হুগলী পয়েণ্ট এবং বিখ্যাত জেমস্ ও মেরী চড়া বিদ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'পরিব্রাজক' পুস্তকে এই চড়া দুইটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জেমস্ ও মেরী চড়া দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীদ্বয়ের মুখে অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃঃ ২৪০০ টন মাল বোঝাই একটী জাহাজ এই চড়ায় লাগিয়া দুই মিনিটের মধ্যে ডুবিয়া যায়। ১৮৭৭ খৃঃ ১৪৪৪ টন গম লইয়া একটী জাহাজ কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইতেছিল। এই চড়ায় লাগিয়া সেই জাহাজও আট মিনিটের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ১৯৩০ খৃঃ যে দিন মহাত্মা গান্ধী লবন আইন অমান্য করেন, সেদিনও একটী লবণ বোঝাই জাহাজ এখানে সলিল-সমাধি লাভ করে। সেইজন্য একটী মাটী-কাটা জাহাজ ভাটার সময় নিয়মিত ভাবে উক্ত চড়ায় মাটী কাটিয়া থাকে।

হিজলী ক্যানেল নাটশালে রূপনারায়ণ নদ হইতে বাহির হইয়া কটক পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্বে এই ক্যানেলে ষ্টীমার চলিত, এখন চলে না। এই পথেই তখন লোকে পুরীধামে যাইতেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই পথেই সম্ভবতঃ একবার পুরীতে গিয়াছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত 'নাটশাল' কি এই নাটশাল? কেহ কেহ বলেন, নাটশাল লঙ্কাজয়ী বিজয়সিংহের নাট্যশালা। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী সারদা দেবী জলপথে এই স্থান দিয়া ঘাঁটাল হইয়া স্বায় গ্রামে কয়েকবার গিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'গহনা নৌকায়' (পান্সীতে) এই পথে জন্মগ্রাম বীরসিংহে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলিরাছিলেন, "একবার ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া গঙ্গায় বহু দূর গিয়াছিলেন এবং খুব বিস্তৃত মোহানা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আমার সমুদ্র দেখার সাধ মিটে গেল।" বোধ হয়, ঠাকুর নাটশালের পার্শ্ববর্তী নদীত্রয়ের মোহানা দেখিয়াছিলেন। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন এই পথ দিয়া ষ্টীমারে পুরীধামে গিয়াছিলেন তখন নাটশালের সরকারী বাংলোতে দুই এক দিন বিশ্রাম করেন। ১৫০।২০০ বৎসর পূর্বে নাটশাল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

সম্ভবতঃ মহিষাদলের মহারাজা কর্তৃক ইহা প্রথম অধিকৃত ও পরিষ্কৃত হয়। তখন উহা দশটী চকে বিভক্ত হয়। সেই দশটী চকের নাম দশ অবতারের নামানুসারে হইয়াছে। নাটশাল গ্রামের যে অংশে রামকৃষ্ণ আশ্রম বর্তমান উহা নরসিংহ চকের অন্তর্গত।

নাটশালে দেবেন্দ্রনাথ খাড়া নামে একজন ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত বাস করিতেন। তিনি ১৩৫২ সালে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন। 'উদ্বোধন' মাসিকের ১৩৫২ আষাঢ় সংখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—"দেবেন্দ্রবাবু শ্রীমৎস্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার ধর্মভাব, ঔদার্য ও অমায়িক ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল।" 'প্রভাত' মাসিকের ১৩৫২ শ্রাবণ সংখ্যায় 'সাধক স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশ-সেবক ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে স্বীয় গ্রামে তাঁত-শিল্প ও চরকা প্রচলন করেন। যৌবনে তাঁহার ধর্মানুরাগ প্রবল হয়। তখন তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে ভাল বাসিতেন এবং সিদ্ধ গুরুর সন্ধান করিতেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে কোলে করিয়া একটি মন্ত্র সোনার অক্ষরে লিখিয়া দিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম লালপুরের কোন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আনিয়া পড়েন। এইরূপে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎশিষ্যবৃন্দের বিষয় অবগত হন। কিছুকাল পরে তিনি পুরীধামে যাইয়া বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট 'শশী-নিকেতনে' মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতে তিনি বেলুড় মঠের একনিষ্ঠ ভক্তসেবক হইয়া উঠেন। তিনি স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশে ঢেঁকি-ছাটা চাউল নৌকায় করিয়া নাটশাল হইতে বেলুড় মঠে পাঠাইতেন। এইরূপে চার পাঁচ বছর ধরিয়া বেলুড় মঠে চাউল সরবরাহ করিতেন। চাউলের মূল্য বাবদ স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে ইন্‌সিওর করিয়া টাকা পাঠাইতেন।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ নাটশালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী প্রেমানন্দকে আনিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার আহ্বানে

তথায় আসিতে প্রথমে সম্মত হন নাই। এক রাত্রি পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "নাটশালে যাব। ঠাকুরের পারমিশান (অনুমতি) পেয়েছি।" তিনি ১৯১৪ সালের ফাল্গুন মাসে বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইবার পর নাটশালে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে গোপাল মহারাজ প্রভৃতি নয় জন ব্রহ্মচারী গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে গেঁওখালিতে আসেন। তথায় তদানীন্তন দারোগার বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম করেন। উক্ত দারোগা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। প্রেমানন্দজী তাঁহাকে বাঙ্গাল বলিয়া ডাকিতেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, দারোগা হয়ত পূর্ব্ববঙ্গের ভক্ত ছিলেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে স্বামী প্রেমানন্দকে একটী কীর্তন দল রাজচকে লইয়া যান। হিজলী ক্যানেলের পাড়ে রাজচক গ্রামে তখন রামকৃষ্ণ আশ্রম অবস্থিত ছিল। তথায় স্বামী প্রেমানন্দ তিন দিন অবস্থান করেন। নাটশাল হইতে মহিষাদল মাত্র তিন মাইল পথ। তখন মহিষাদল ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন শচীন্দ্রনাথ বসু। শোনা যায়, তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। উৎসব আয়োজনে তিনিও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। গেঁওখালির দারোগার ডাকে ১৫০ ২০০ চৌকীদার আসিয়া আশ্রমের পার্শ্ববর্তী ধান্যক্ষেত্র উৎসবের জন্য পরিস্কৃত করিয়া ফেলে। পরিস্কৃত মাঠে একুশটি উনুন খোঁড়া হয় এবং খিচুড়ী ও তরকারী রান্নার জন্য একুশজন পাচক নিযুক্ত হয়। রাশীকৃত শাকসব্জী কাটিয়া অনতিবিলম্বে প্রস্তুত করা হইল। পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের ভক্তগণ আসিয়া উৎসবের কাজে লাগিলেন। মহিষাদল হইতে সামিয়ানাদি আনিয়া খাটান হইল। স্বামী প্রেমানন্দ যখন গেঁওখালি হইতে প্রথম রাজচক আশ্রমে আসেন তখন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। প্রেমানন্দজী যখন জানিলেন উক্ত শিক্ষক কোন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত মাষ্টার দেখছি।" তিনি উক্ত পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উৎসবের আবশ্যকীয় আয়োজনের অভাবে উক্ত শিক্ষককে বিষন্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "একবার

পূর্ব্ববঙ্গে কোন স্থানে উৎসব করতে গিয়েছিলাম। তথায় প্রথমে যেতে ইচ্ছা হয় নি। পরে ঠাকুর পারমিশান (অনুমতি) দিলেন ও বললেন, "যা, গেলে কিছু কাজ হবে।' সেখানে ত্রিশ সের চিড়ায় নয় শত লোক খাইয়েছিলাম।" ঠাকুরের অন্যান্য অন্তরঙ্গ শিষ্যের ন্যায় ঈশ্বরকোটী প্রেমানন্দও ঈশ্বরাদেশে সর্ব কর্ম করিতেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে আনন্দের হাট বসিত। তাঁহার উপস্থিতিতে নাটশালেও অপূর্ব্ব উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে উৎসব-প্রাঙ্গণে সমবেত গ্রামবাসীর নিকট তিনি একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন এবং ঠাকুরের জীবনী ও বাণী বলিলেন। সভান্তে চৌদ্দ হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ী প্রসাদ খাইলেন। তৎসঙ্গে আগত ব্রহ্মচারীগণ প্রসাদ পরিবেশন ও তত্ত্বাবধান করিলেন। উপবিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে একটী পরিচিত মুসলমানও বসিয়া খিচুড়ী খাইতেছিল। তাহা দেখিয়া কোন স্থানীয় ভক্ত তাহাকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করেন। দূর হইতে ইহা দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হন এবং মুসলমানটীকে খাইতে অনুমতি দেন এবং মহানন্দে হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলেন, "এ পুরুষোত্তমপুরী। এ পুরুষোত্তমপুরী।" উপবিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে শ্রেণীর পর শ্রেণী ঘুরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'পুরুষোত্তমপুরী' 'পুরুষোত্তমপুরী।' যেখানে নিত্যসিদ্ধ প্রেমানন্দ উপস্থিত এবং ভক্তগণ নবযুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ খাইতেছেন তাহা সত্যই পুরীধাম, পুরুষোত্তমপুরী! এই উৎসব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল এবং সারা জেলায় সাড়া পড়িয়া গেল। ইহাই মেদিনীপুর জেলায় প্রথম রামকৃষ্ণ উৎসব।

উৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্নে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের ও স্বামিজীর ছবি দুইটী রাজচক আশ্রমে পূজা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুরের ছবিটী দিয়াছিলেন উল্লেখিত ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ। সেই ছবিটী এখনো নাটশাল রামকৃষ্ণ আশ্রমে নিত্যপূজিত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ উক্ত ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিত হইতেছেন। কি পূত স্মৃতি!

স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিজীর যে ছবিটী পূজা করেন সেটি একটী বৃহৎ তৈলচিত্র এবং আজড়ার সিদ্ধশিল্পী শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ জানা কর্তৃক অঙ্কিত। সেটীও অদ্যাপি

নাটশাল রামকৃষ্ণ আশ্রমে সযত্নে রক্ষিত। শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ অজ্ঞাত হইলেও অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী। মহিষাদল রাজপ্রাসাদে তৎকর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান। কলিকাতায় আসিয়া বসিলে তাঁহার সুনাম আরও প্রসারিত হইত। সুখের বিষয়, তিনি অদ্যাপি জীবিত। শচীন বসুর আহ্বানে স্বামী প্রেমানন্দ রাজচক হইতে মহিষাদলে যান। সেখানে দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া তিনি মোটর গাড়ীতে তমলুকে যান এবং তথায় বর্গভীমা মন্দিরে অবস্থান করেন। তথায় স্বর্গগত গিরিজা অধিকারী প্রভৃতির সাহায্যে বর্গভীমা মন্দিরের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি তমলুক সেবাশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রেমানন্দজী তমলুক হইতে পুনরায় নাটশালে ফিরিয়া আসেন এবং সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নাটশালে স্বামী প্রেমানন্দ যে উৎসব করিলেন তাহা দ্বারাই মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ আন্দোলনের উৎপত্তি হইল। ১৯১৭ খৃঃ তিনি মেদিনীপুর সহরে পদার্পণপূর্বক তত্রস্থ সেবাশ্রমের সূত্রপাত করেন। রাজচকেই রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর ছিল। স্বামী প্রেমানন্দের পূত স্পর্শে উক্ত আশ্রম মহাতীর্থে পরিণত। বেলুড় মঠের বহু সাধু ও ভক্ত উক্ত তীর্থ দর্শনে গিয়াছেন। ১৩৪৯ সালে যে ভীষণ বন্যা হয় তাহাতে আশ্রমের পূর্ব তিনটি ঘর পড়িয়া যায়। তৎস্থলে বর্ত্তমান একটি ঘর করা হইয়াছে। উল্লিখিত উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী একটি ভক্ত পত স্মৃতি বুকে ধরিয়া সেই আশ্রমে এখনও বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ ১৩৩১—৩২ সালে রাজচক হইতে আশ্রম বর্তমান স্থায়ী জমিতে উঠিয়া যায়। বর্তমান নাটশাল আশ্রমের জন্য পূর্ব্বোক্ত ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ চারি হাজার টাকার সম্পত্তি এবং নগদ্ পাঁচ শত টাকা দান করেন। তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন আশ্রমের কাজে প্রাণপাত করিয়াছেন। প্রেমানন্দজী তাঁহার বাড়ীতে দুই এক দিন অবস্থান করেন এবং তাঁহার ভক্তিতে ও সেবায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার বাড়ী থেকে অনেক সাধু বেরুবে।" সিদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে সাত আট জন যুবক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী

হইয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রাণপাতী পরিশ্রমেই নাটশাল আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা পত্রে ও পুষ্পে এবং শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। নাটশাল আশ্রমে ইষ্টকনির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দির, প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাঁতশাল, কাঠের কারখানা এবং বই-বাঁধান বিভাগ হইয়াছে। উক্ত আশ্রমের প্রসিদ্ধি মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলাত্রয়ে বিস্তৃত।

মেদিনীপুর জেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বিশটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—মেদিনীপুর, তমলুক, চণ্ডীপুর, কাঁথি, নাটশাল, বরদা, পুরুষোত্তমপুর (নন্দীগ্রাম), ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, কোলাঘাট, বালীচক, বলরামপুর (খড়্গপুর), খঞ্জনচক, খেপুত, রাইন, কুলহাণ্ডা, গোপীনাথপুর (চন্দ্রকোণা), উত্তর কৃষ্ণনগর, তেখালী ও বিষ্ণুপুর। এই বিশটী আশ্রমের মধ্যে প্রথম চারটী বেলুড় মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাকী ষোলটী স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক পরিচালিত। মহাপুরুষ যে কার্য্য করেন তাহার ফল কত সুদূর প্রসারী হয় তাহা ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

পঞ্চম

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মবিজ্ঞান *

ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানকে মার্কিণ মস্তিষ্কের অবদান বলা যাইতে পারে। যদিও উহা তরুণ বিজ্ঞান; তথাপি উক্ত বিষয়ে ইতোমধ্যেই বিশাল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রসিদ্ধ মার্কিণ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম জেম্‌স রচিত 'ধর্মীয়

---

* দক্ষিণ ভারতের অধুনালুপ্ত 'হিন্দু মাইণ্ড' নামক ইংরাজী মাসিকে ১৯৩৪ খ্রী. সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

অনুভূতির বৈচিত্র্য' নামক ইংরাজী পুস্তক সম্ভবতঃ উক্ত বিজ্ঞানের প্রথমতম অগ্রগণ্য পুস্তক; কিন্তু স্টারবাক, স্ট্রাটন, আমিস, লিউবা, প্র্যাট প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও মনোবৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ে সারগর্ভ গবেষণামূলক অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

আধুনিক কালেও অহঙ্কৃত ও পক্ষপাতী বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতকে তমসাচ্ছন্ন দেশ বলিয়া অবজ্ঞা করেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস লেখক মার্কিন অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক থিলি ভারত সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে, তাঁহার মতে ভারতবর্ষে দর্শনের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয় নাই। পরাধীন ভারতেও দার্শনিক ভাবধারার সমুৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। উহার দ্বারা আধুনিক পৃথিবীর চিন্তাধারা গভীর ভাবে সমৃদ্ধ হইতেছে। সমসাময়িক জগতে যে উচ্চ চিন্তা সৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে ভারত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রায় অর্ধশতক পূর্বে ধর্ম, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতীয় চিন্তার সমালোচনা ও হাস্যকৌতুকে পরিপূর্ণ ছিল। তখন ভারতীয় ভাবধারার সমাদর ও অবগতি পাশ্চাত্যে অধিক হয় নাই; কিন্তু বর্তমান কালস্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় ভাবে ভারতীয় ভাবধারার মূল্য ও বিশেষত্ব বুঝিতেছেন।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে জার্মানী সর্বপ্রথমে ভারতীয় চিন্তার উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেন। পল ডয়সন প্রণীত 'বেদান্ত দর্শন' ও 'উপনিষৎ দর্শন' এবং মোক্ষমূলারকৃত ঋগ্বেদের অভিনব সংস্করণ ইউরোপে ও আমেরিকায় দার্শনিক আলোড়ন সৃষ্টি করিল। তখন মার্কিন মহাদেশ হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া ভারতকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইল। চিকাগোতে আহূত বিশ্বধর্ম মহাসভায় বর্তমান জগৎ মহাভারতের ঈশ্বর-প্রেরিত প্রতিনিধি বিবেকানন্দের মুখে বেদবাণী শুনিয়া বিস্মিত হইল। চিকাগোতে স্বামিজীর সাফল্য পাশ্চাত্যে যুগান্তর আনিল। তখন হইতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন নবীন ইয়াঙ্কি জাতিকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করিতেছে।

মার্কিন মনীষিগণ ইহার ফলে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহে ভারত সম্বন্ধে

সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিতে লাগিলেন। উইলিয়াম জেম্‌সের 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্‌' এবং 'ভেরাইটিজ অব রিলিজাস এক্সপিরিয়েন্স' এবং জোসিয়া রয়ের 'দি ওয়ার্ল্ড এ্যাণ্ড দি ইণ্ডিভিজুয়াল' এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান ও এমারসন প্রভৃতির গ্রন্থেও হিন্দু চিন্তা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক সমুল্লেখ দেখা যায়। ধর্মীয় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও মার্কিন মনোবৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ ভাবে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট। বিখ্যাত মার্কিন অধ্যাপক ও গ্রন্থকার ডক্টর জে. বি. প্র্যাট তৎপ্রণীত 'দি রিলিজাস কনসাসনেস' নামক পুস্তকে ভারতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে ধর্মতত্ত্বের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত। ইহাতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ভারতীয় চিন্তার বহুল উদ্ধৃতি এবং পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন তিনি বলেন, "ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণের রহস্যবাদে দেখা যায়, ধর্মভাবে আবিষ্ট হইয়া সাধকগণ সম্পূর্ণ ভাবে বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান মিস্টিকগণ হিন্দু যোগীদিগের মত কখনো কখনো বাহ্য সংজ্ঞা হারাইতেন। কেবল খ্রীষ্টান মিস্টিকগণের জীবনেই এইরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটে, ইহা বিবেচনা করা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ ভারতই ইহার প্রকৃত জননী।" এই মার্কিন মনীষী ও দর্শনাধ্যাপক স্বয়ং ভারতে আসিয়া ভারতীয় ধর্মসম্পৎ স্বচক্ষে দর্শন করেন। তিনি শুধু ভারতের ধর্মসাহিত্য গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আর্যসমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি আধুনিক ধর্মান্দোলনসমূহের সংস্পর্শে আসেন। তিনি 'ভারত ও উহার ধর্মসমূহ' নামক যে সুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সমধিক জনপ্রিয় পুস্তক। তৎপ্রণীত পূর্বোক্ত 'ধর্মানুভূতি' নামক গ্রন্থে রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি বর্তমান ভারতের ধর্মগুরুগণের উক্তি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত। এইরূপে দেখা যায়, আধুনিক ধর্মবিজ্ঞান ক্রমশঃ ভারতীয় অবদানকে স্বীকারপূর্বক স্ব স্ব গ্রন্থে আলোচনা করিতেছেন। এইজন্য প্র্যাট প্রমুখ সমুদার ও মহামনা ব্যক্তিগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। প্রাচীন হিন্দুগণ ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর গবেষণান্তে প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তৎসমুদয় কোন

পুস্তকে একত্রে পাওয়া যায় না বলিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল অগ্রাহ্য করেন। সম্ভবতঃ অন্য কোন দেশ ধর্মবিজ্ঞানে এত দূর অগ্রসর হয় নাই। আমাদের ধর্মবিজ্ঞান কঠিন সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া উহার ভাবসম্পৎ আধুনিক ভাষাবিদ্‌গণের নিকটে পরিচিত নহে। ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞানকে সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধার করিয়া জীবিত ভাষাসমূহে প্রকাশনই আধুনিক পণ্ডিতগণের বিশেষ কর্তব্য। শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় দর্শনাচার্যগণ ইংরাজীতে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তৎদ্বারা এই মহৎ কার্য্যের শুভারম্ভ হইয়াছে। জেরাল্ডিন কস্টার তৎপ্রণীত নূতন ইংরাজী গ্রন্থ 'পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও যোগ' এ তুলনামূলক আলোচনা সহায়ে দেখাইয়াছেন যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণের অভিনব সিদ্ধান্তসমূহ হিন্দু যোগের দূরাগত প্রতিধ্বনি। জুঙ্গ, বুদোইন, ম্যাকডুগাল, স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে সপ্রশংস অভিমত দিয়াছেন।

এখন আমি হিন্দু ধর্ম অনুসারে ধর্মবিজ্ঞানের প্রধান সমস্যাগুলি বিচার করিব। যদিও বিচার্য বিষয় জটিল ও বিশাল তথাপি আমরা উহার মূলভাব আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। জড়বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-ধারা ধর্মবিজ্ঞানে বিশেষ কার্যকরী হয় না। কিন্তু ধর্মকে একটি বিজ্ঞানে পরিণত না করিলে ধর্মনামে এই যুগে যে বিকৃত ও অর্থহীন অনুষ্ঠান চলিতেছে তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইবে না। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্ম এত অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠানমূলক ও কুসংস্কারগ্রস্ত হয় যে উহাতে অধর্মীয় উপাদান অনায়াসে প্রবেশপূর্বক উহার পবিত্রতা পঙ্কিল করে। ধর্মীয় অনুভূতিসমূহকে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আলোকে না দেখিলে অপ্রকৃতিস্থ, মদমত্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণকেও ধর্মবীর বলিয়া ধরিতে হয়। যদিও ধর্মতত্ত্ব স্বসংবেদ্য তথাপি মনোবিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর ও জীবনবৃত্তান্ত এবং ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিচার দ্বারা ধর্মনীতি ও ধর্মানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করে। আমরা উল্লিখিত প্রণালী চতুষ্টয়কে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না ভাবিলেও ধর্মজীবনের

সংস্কার বা ধর্মানুভূতির বিচারে উহারা নিঃসন্দেহে সহায়ক। যদি কোন ধর্ম সাধক বৈজ্ঞানিক হন তাহা হইলে তিনি ধর্মবিজ্ঞানের অনুশীলনে উচ্চতম সাফল্য লাভ করিবেন। পাশ্চাত্যে ধর্মবিজ্ঞান কেবল শৈশবে উপনীত। তথাপি উহা খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের উপর গভীর আলোক সম্পাত করিয়াছে। এই দুই সেমিটিক ধর্ম গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার বৃহৎ স্তুপরূপে পরিণত। আধুনিক ধর্ম-বিজ্ঞান নির্ভয়ে উল্লিখিত ধর্মদ্বয়ের সাম্প্রদায়িকতা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যবর্তী ধর্মদোষগুলি বিশ্লেষণ করিয়াছে। যুক্তিবাদের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া ধর্মবিজ্ঞান সর্বধর্মের দোষগুলি প্রদর্শনপূর্বক ধর্মজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। ডক্টর এ. আর. ইউরেন তৎপ্রণীত 'আধুনিক ধর্মীয় মনোবিজ্ঞান' নামক ইংরাজী পুস্তকে বলেন, "ইউরোপে আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ ধর্মকেন্দ্রিক কুসংস্কারে মৃত্যু-শেল হানিয়াছেন। ইহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বর্তমান ধর্মজগৎ কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার কবল হইতে মুক্ত হইতেছে।" ধর্মভূমি মহাভারত বিবদমান ধর্মসম্প্রদায় পরস্পরদ্বেষী মতবাদে অধুনা জর্জরিত। সুতরাং ধর্মবিজ্ঞান বর্তমান ভারতে যোগ্য স্থান পাইলে ভারতীয় ধর্মজীবন অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও গণ্ডীমুক্ত হইবে। নৈয়ায়িক পর্যালোচনা সহায়ে পাশ্চাত্য ধর্মবিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হিন্দু ধর্ম বহু শতক পূর্বে তৎসমুদয় সম্যক্ অধিগত করিয়াছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অমরত্ববাদের বিষয় আলোচনা করা যায়। দুইটি ভারতীয় ধর্ম—হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন ধর্মের আস্থা নাই। বিশেষতঃ ইহুদীধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম ইহাতে অবিশ্বাসী। উল্লিখিত ধর্ম-ত্রয়ের মতে জন্মের সঙ্গে আত্মার উৎপত্তি এবং মৃত্যুর সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ভারতীয় মতবাদ—পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ প্রচারের জন্য ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী প্রমুখ থিয়জাফিক্যাল সোসাইটীর নায়কবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদার্হ; কিন্তু খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদীগণ ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশ্য ধর্মবিজ্ঞান উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উক্ত ধর্মত্রয়ের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী প্র্যাট বলেন, "অমরত্বে বিশ্বাস মানব মনে জন্মগত, শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে। মানব মনে একটি সহজাত অনুভব আছে যে, মানুষ কদাপি কুত্রাপি

নিশ্চিহ্ন হয় না।" পারলৌকিক গবেষণা সমিতির নেতৃবৃন্দ—সার অলিভার লজ, প্রফেসার হাইসলপ, ফ্রেডারিক মায়ার্স প্রভৃতি পরলোক-তত্ত্ববিৎগণ মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব জাতির বিশ্বাস বর্ধনে অপরিসীম প্রয়াস করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শিশু স্বীয় জীবনের পূর্বাপর অখণ্ডত্ব সহজে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর ঘটনা সে অনন্ত বিস্ময় সহকারে শিক্ষা করে। ইংরাজ মনীষী বর্ট্রাণ্ড রাসেল তৎপ্রণীত 'শিক্ষা সম্বন্ধে' ইংরাজী পুস্তকে (১৭১ পৃষ্ঠায়) তৎপুত্র বিষয়ক অদ্ভুত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমার বালক পুত্রের অস্তিত্ব এক সময় ছিল না—এই ঘটনা আমি কিছুতেই তাহার বুদ্ধিগত করাইতে পারিলাম না। যদি আমি তাহাকে মিশরের পিরামিড বা অন্য কোন প্রাচীন ভবনের কথা বলি তাহা হইলে সে সর্বদা জিজ্ঞাসা করে, সে তখন কি করিতেছিল? আমি যখন তাহাকে বারংবার বোঝাই, সে কেবলই বিস্মিত হয়।"

এইরূপে ইহা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কখনো তাহার চরম বিনাশে বিশ্বাসী নহে। সে আজন্ম বিশ্বাসী যে, অমরত্বের অণুকণা তন্মধ্যে বিদ্যমান। স্ট্রাটন তৎপ্রণীত 'ধর্মীয় জীবনের মনোবিজ্ঞান' নামক ইংরাজি পুস্তকে বলেন, "আত্যন্তিক অনস্তিত্বে বিশ্বাসের আগ্রহ মানসিক অবসাদের লক্ষণ। মানুষ এই অবিচলিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয় যে, মৃত্যু একটী স্থূল অনুভব মাত্র এবং ইহা সত্ত্বেও আত্মা বাঁচিয়াই থাকে।"

একই মর্মে প্র্যাট বলেন, "রুগ্ন অবস্থায় কেবল ক্লান্তি ও শ্রম হেতু অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত এই বিশ্বাস অনেক মানুষে হ্রাস পায়। জীবন মৃত্যুর পরেও স্থায়ী হয়, কবরকে অতিক্রম করে, ইহা মানব মনে জন্মগত। অনন্ত অস্তিত্বের ধারণা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে অনুভূত হয়।" ইহা বিচার-সম্ভূত নহে। অন্তর্দৃষ্টি ও যোগজ প্রজ্ঞার ফলে এই অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি জন্মে।" এমার্সন সত্যই বলেন, "সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি অমরত্বে বিশ্বাসী। উক্ত বিশ্বাসের কারণ প্রদর্শন অসম্ভব। উহার আসল প্রমাণ অতি সূক্ষ্ম এবং লিপিবদ্ধ করাও সাধ্যাতীত।"

প্র্যাট, লিউবা, শিলার এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মনো-বৈজ্ঞানিক অনেক

মানুষের নিকট প্রশ্ন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য। শতকরা ৮০ জন উত্তরদাতা সম্মতিসূচক জবাব দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শতকরা হার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নর-নারীর মধ্যে অল্প এবং অশিক্ষিত সাধারণ নর-নারীর মধ্যে অধিক ছিল। ডক্টর ই. গ্রিফিথ জোন্স 'বিশ্বাস ও অমরত্ব' নামে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ভবিষ্যৎ জীবনে অমরত্বে বিশ্বাসের অভাবের কারণ এই তিনটি—(১) যুক্তিবাদীয় ও সন্দেহদুষ্ট প্রবণতার সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের প্রসার (২) ইহ জগতে আধুনিক মানবের অনুরাগের কেন্দ্রীভবন, (৩) পরলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কোন মতবাদের সহিত সমসাময়িক ধর্মতাত্ত্বিকগণের বিরোধিতা বা অসম্মতি। অমরত্বে এই বিশ্বাস মানুষকে সর্বব্যর্থতা ও দুর্বলতায় সান্ত্বনা ও প্রেরণা দান করে। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেন, "মৃত্যু জীবনের শেষ নয়; বরং ইহা অনন্ত জীবনের আরম্ভ।" নরওয়ে দেশের প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্ট্রিণ্ডবার্গ এই মনোজ্ঞ মন্তব্য করেন যে, যখন মৃত্যু আসে তখনই হয়ত জীবন আরম্ভ হয়। মানব মনে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অন্তস্থলে এই তত্ত্ব বিরাজমান যে, তাহার অক্ষয় অস্তিত্ব আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস কোন বস্তু হইতে ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে। ইহাই ইহার স্বতঃপ্রমাণ। জার্মাণ মহাকবি গ্যেটে মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন, "অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আত্মা ক্রিয়াশীল। যে সূর্য পার্থিব চক্ষুতে অস্তমিত বলিয়া নিত্য প্রতীয়মান তাহার মতই এই আত্মা মৃত্যু দ্বারা নিহত হয় না। ইহা অনন্ত কাল ধরিয়া নিত্য সূর্যবৎ উদিত থাকে। তুমি কি মনে কর যে, কোন শববাহী কফিন আমাকে কবরখানায় লইয়া যাইতে পারে?" আত্মার অমরত্বে তদ্রূপ নিশ্চয়তার সহিত সক্রেটিস হাসিমুখে হেমলক বিষ পান করিয়াছিলেন। উইলিয়াম জেম্‌সের ভ্রাতা এবং সুবিদিত মার্কিণ লেখক হেনরী জেমস্ বলেন, "অনন্ত জীবনই মহত্তম শৈল্পিক আনন্দ, উচ্চতম ধারণার্হ মঙ্গল—এই বিশ্বাস ব্যতীত গভীরতার সমস্যা অর্থহীন। শূন্য অনস্তিত্বের চিন্তা মানুষকে সন্ত্রস্ত করে। প্রদীপশিখার মত কেহ নির্বাপিত হইতে চায় না। অন্যতম সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলী জীবন-সায়াহ্নে কোন বন্ধুর নিকট

লিখিয়াছিলেন, "বিনাশের চিন্তার প্রতি আমার বীতস্পৃহা ততই বাড়িতেছে যতই আমি বয়োবৃদ্ধ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।"

গোটের এই উক্তি প্রায়শঃ উদ্ধৃত হয়—চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, কখনো তাহার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইবে এবং সে জীবন ধারণ ও চিন্তা করিতে বিরত হইবে। এই জ্ঞানগর্ভ প্রবাদ সত্যই প্রচলিত—সকল মানুষ ভাবে যে, তাহারা ব্যতীত আর সকলেই মরিবে। 'কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরং?' কেহই নিজেকে বিমৃত বা প্রণষ্ট কল্পনা করে না। জার্মাণ দার্শনিক হফডিং তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'ধর্মীয় দর্শন' এ সত্যই মন্তব্য করেন যে, মানুষকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষাদানই ধর্মের মূল কথা। মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস প্রথামাত্র বা দিবাস্বপ্ন মাত্র নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস অপেক্ষা ইহা অধিকতর মৌলিক ও প্রবল। অমরত্বে বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিত্তিহীন। সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেন যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস আত্মবিশ্বাসের অনুবর্তী। পিরামিড সংক্রান্ত ইতিবৃত্তে এবং প্রাচীন মিশরের 'প্রেত-পুস্তকে' এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এবং উপনিষদে অমরত্বে বিশ্বাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপদিষ্ট। বাইবেলে ও কোরাণে অনন্ত জীবনের কথা উল্লিখিত থাকিলেও খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ ইহাতে বিশ্বাসী নহে। ইসলামীয় সুফী সম্প্রদায় নিশ্চিত প্রকারে পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করেন। অমরত্বে বিশ্বাস কি পুনর্জন্মবাদের ভিত্তিস্থানীয় নয়? আত্মার মৃত্যুহীনতায় অবিচলিত বিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রাণশক্তি। ডক্টর প্র্যাট বলেন, "ভারত ভ্রমণে গমন করিলে যে সকল বিষয় অনিবার্যভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে তন্মধ্যে একটি এই যে, পাশ্চাত্য প্রভাবের অধীনে যাহারা আসিয়াছে তাহারা ব্যতীত সমাজের সর্বশ্রেণীর নর-নারী অমরত্বে বিশ্বাসে বলীয়ান্। যদি আমি স্বীয় অভিজ্ঞতায় আস্থা স্থাপন করি তাহা হইলে আমি ইহা বলিতে বাধ্য হইব। এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সামান্য কাল্পনিক সন্দেহবাদ শিক্ষিত মানসেই বিদ্যমান। কিন্তু এই বিশ্বাস ভারতবাসীর অন্তরে বিস্ময়কর ভাবে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।" অধ্যাপক প্র্যাট মন্তব্য করেন যে, ইহার ফলেই খ্রীষ্টান ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম অধিকতর শক্তিতে বিমণ্ডিত।

ধর্মের প্রাণস্বরূপ মিস্টিসিজম সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া আমরা ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এই আলোচনার উপসংহার করিব। আমরা এখন দেখিব, ধর্মবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের আলোকে ধর্মের কি সংজ্ঞা হইতে পারে। প্র্যাটের মতে ভাগ্য-বিধাতার (Determiner of Destiny) প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্ম বলা যায়। এই সংজ্ঞা প্রচলিত বা চিরাচরিত ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ইহা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নহে। ধর্ম মানবের মনে বিশ্ববিষয়ক মনোভাব (Cosmic sense) সৃষ্টি করে; কিন্তু এই মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধিগত সম্মতিমাত্র হইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত ধর্ম-সংজ্ঞা আমাদের মনঃপূত। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম। যতক্ষণ না কেহ সর্বোচ্চ সত্য বা চরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি না করে ততক্ষণ ধর্ম তাঁহার সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ও পরমার্থপ্রবণ করিতে পারে না। এই উপলব্ধি এক প্রকার যৌগিক বা তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা; ইহাতে ঈশ্বর অনুভূত বা ইন্দ্রিয়-গোচর হন। ইহাকে যোগশাস্ত্রে সমাধি এবং বেদান্ত দর্শনে তুরীয় অবস্থা বলে। এই অবস্থায় বাহ্য জগৎ, এমন কি প্রিয় দেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই অবস্থা প্রায়ই লাভ করিতেন। কলিকাতায় জানবাজারে রাণী রাসমণির ভবনে যখন তাঁহার এই অবস্থা হয় তখন তাঁহার দেহ জ্বলন্ত কয়লায় লাগিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানিতে পারেন নাই। কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে তিনি যখন সমাধিস্থ হন তখন মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ডাক্তারগণ তাঁহার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখিলেন, উহাতে আদৌ পলক পড়িল না। শুধু তাহাই নহে; উক্ত অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন এবং নাড়ী-গতি পর্যন্ত বন্ধ হইত। এই অবস্থা মৃত্যুবৎ হইলেও মৃত্যু নহে; কারণ সমাধিভঙ্গের পর আবার দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ইহা সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাও নহে। সুষুপ্ত বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বা নাড়ীর ক্রিয়া চলিতে থাকে। ধর্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞানের আধুনিক প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার জীবনালোকে ধর্মতত্ত্ব সহজবোধ্য হয়।

কাশীধামের মৌন যোগী ত্রৈলিঙ্গ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,

"সমাধিতে অনুভূত হয়, ঈশ্বর একমেব অদ্বিতীয়।" সুতরাং ঈশ্বর বা সত্যের স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। ডক্টর প্র্যাটের মতে মানব মনের গঠন অনুসারে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হই যে, ধর্মগ্রাহ্য ভগবান নিশ্চয়ই কোন প্রকার অদ্বৈতবাদ সম্মত পরমার্থ সত্তা খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদী ধর্মত্রয় একেশ্বর বাদী হইলেও অদ্বৈতবাদী নহে; কিন্তু হিন্দুধর্ম বহুঈশ্বরবাদী হইয়াও অদ্বৈত বাদে সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদে অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র এই বাক্যে ধ্বনিত হইয়াছে।—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।" ইহার অর্থ, সদ্বস্তু একমাত্র হইলেও বিপ্রগণ তাঁহাকে বহুরূপে ব্যাখ্যা করেন। সকল প্রকৃতির মানুষকে এক পথের ব্যবস্থা দিয়া সেমিটিক ধর্মত্রয় ধর্মজগতের এক বৃহৎ অংশে সর্বনাশ আনিয়াছে; কিন্তু হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদ মানুষকে ধর্ম-জীবনে অসীম স্বাধীনতা দিয়াছে। সেইজন্য সর্বশ্রেণীর মানবের প্রতি হিন্দু ধর্মের প্রতি মর্মস্পর্শী আবেদন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ। তাঁর ইতি করা যায় না।" ভারতীয় ধর্মবিজ্ঞান অনুসারে ইহাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী আলডাশ হাক্সলী বলেন, "একেশ্বরবাদ বা বহুঈশ্বরবাদ সমান ভাবে সত্য ও প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর একাধারে এক ও বহু। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্ম অনুপযোগী ও অবাস্তব। অতএব ইহা মানব মনের উপযোগী নহে। পরম পিতার ধর্মে নিশ্চয়ই বহু দেবতার স্থান আছে। মানসিক গঠন ও সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকে এক এক দেবতার উপাসনা করিতে পারেন।" এইজন্যই বৈদিক ধর্ম তেত্রিশ কোটী হিন্দুর জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাধিতে সকল ইষ্টদেবের নাম-রূপের মূলে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধ হয়।

সর্বযুগের ও সর্বদেশের ভক্ত-সাধকগণ একবাক্যে স্ব স্ব অনুভূতি-বলে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সমাধি বা তুরীয় অবস্থায় নিজেদের সসীম ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ভাগবত সত্তার সহিত একীভূত হন। সেই অবস্থায় জীবাত্মা দিব্য জ্ঞান ও আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করে। উইলিয়াম জেম্‌সও নির্দেশ করেন যে, নামরূপাতীত অনুভূতির গতি ও বেগ অদ্বৈতমুখী। এই অনুভূতির

আলোকে সাধক স্বীয় অন্তঃস্থলে ঈশ্বর দর্শন করেন; বহির্জগতে তিনি কোথাও ঈশ্বরের দর্শন পান না। তজ্জন্য হিন্দু স্তিমিত নয়নে ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন হয়; উন্মীলিত নয়নে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে প্রার্থনা করে না। বিবিধ ধর্মীয় অনুভূতির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা যায়, ঈশ্বর স্বরূপতঃ মানবাত্মায় বিরাজিত, অন্যত্র নহে। শুধু তাহাই নহে; ধর্মবিজ্ঞান তদধিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। আধুনিক ধর্মবিজ্ঞান ভাগবত স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদীয় সংজ্ঞার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করে যে, ভগবান মর্ত্য বা সর্গের কোন মন্দিরে নিবাস করেন না এবং মানব হৃদয়ই তাঁহার প্রিয়তম বাসস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ সরল ভাবে বলিতেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" প্লটিনাশ, ডাইনোসিয়াস, একহার্ট প্রভৃতি অমর মিস্টকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ স্বরূপতঃ ঈশ্বর বা আত্মা। মানব মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। সমাধিতে সর্বোচ্চ সত্য প্রকটিত হয়। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে সাধক অবগত হয় যে, যে পরতত্ত্ব বা শাশ্বত সত্তার জন্য সমগ্র জীবন সে সারা দুনিয়ায় সাগ্রহ সন্ধান করিতেছিল সে স্বরূপতঃ উহা হইতে অভিন্ন। তাই উপনিষদে বৈদিক ঋষি জিজ্ঞাসু শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "তৎ ত্বম্ অসি।" অর্থাৎ তিনিই তুমি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। সুতরাং যদি কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহেন তিনি ঈশ্বরের জন্য মন্দিরে বা গির্জায় বা মসজিদে না খুঁজিয়া স্বীয় অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেন। এই জন্য সর্বশাস্ত্রময়ী ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুনঃ তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়-মন্দিরে ঈশ্বর সমাসীন। জিশু খ্রীষ্ট বাইবেলে বলিয়াছেন, "মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, "মানুষ স্বর্গীয় বৃক্ষ, পার্থিব বৃক্ষ নহে। সাধকের পক্ষে স্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীনতাই উক্ত সত্যানুভূতির একমাত্র সর্ত।

ইহাই ধর্মানুভূতির মূল সর্ত। অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, সর্বধর্মের সাধকগণ ইহা ভুলিয়া বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে আসক্ত হন। কঠোপনিষদে আছে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্রহ্মলাভের অদৃঢ় প্লব, অযোগ্য ভেলা। শ্রীরামকৃষ্ণের

সাধন-জীবনে দেখা যায়, অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিকতাই অনুভূতির প্রকৃষ্টতর উপায়। প্রথম অবস্থায় অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মসাধন অসম্ভব হইলেও পরবর্তী অবস্থায় ইহা বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাকুলতা ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন বা জ্ঞানলাভ সুদূর পরাহত। অনুভূতির জন্য জগৎ ও দেহের সম্যক্ বিস্মৃতি প্রয়োজন। বৈরাগ্যানলে জীবন সন্তপ্ত না হইলে অন্তর্মুখীনতা আসে না। প্লেটো বলেন, "শুধু জগৎকে বিস্মৃত হওয়া নহে; সাধকের পক্ষে জগৎ কর্তৃক ও বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক।" দেহ-বোধ আসিলে প্লটিনাশ লজ্জিত হইতেন। জীবন-সায়াহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি দেহ ধারণ করেছি, এই কথা একেবারে ভুলে গেছি। দেহবোধই সর্বাপেক্ষা বড় পাপ।" এই দেহ বোধ হইতে মুক্তি লাভের জন্য সর্বদেশের সাধকগণ কর্তৃক অসংখ্য উপায় উদ্‌ভাবিত ও অবলম্বিত। এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান সাধক পিয়ার ডেলিয়াণ্টারা কঠোর তপশ্চর্যা করেন। তিনি চল্লিশ বৎসর যাবৎ দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘণ্টা ঘুমাইতেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তপস্যারত ছিলেন তখন তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর আদৌ নিদ্রিত হন নাই, তাঁহার চক্ষে পলক পড়িত না। উক্তরূপ মানসিক একাগ্রতা লাভের জন্য সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়া চেষ্টা যত্ন করা দরকার। ধর্মানুভূতি সহজ ব্যাপার নহে। ইহা বিশ্বের কঠিনতম কর্ম। দৈহিক ও মানসিক শক্তি সামগ্রিক ভাবে প্রয়োগ ব্যতীত উক্ত কর্ম সিদ্ধ হয় না। কেবলমাত্র তরুণ সাধক এই সংগ্রামে চরম সিদ্ধি লাভে সমর্থ। তাই শাস্ত্রে আছে, 'যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাৎ।' যুবাকালেই ধর্মশীল হইবে। হরি ওঁ।

——

ষষ্ঠ

বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক ঐক্য *

অতিমানব শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য এই বৎসর পৃথিবী-ব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। 'যত মত তত পথ' ছিল পরস্পর বিবদমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহার প্রধান বাণী। অর্ধশতকেরও অধিক হইতে চলিল, তিনি এই মহাসত্য স্বীয় অদৃষ্টপূর্ব মহাজীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি সভ্যতা-গর্বিত ও শিক্ষাভিমানী মানব ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তাহা বিচার ব্যতীত গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার আলোকে আমরা প্রধান প্রধান ধর্মের মৌলিক ঐক্য প্রদর্শনপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীর সুগভীর সার্থকতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব।

ধর্মসংঘসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম-সংঘ প্রথমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, তৎপরে বিদ্যাবৃদ্ধি এবং শেষে কর্মপ্রসারে মনোনিবেশ করিয়াছে। মানুষের মন এমন বহির্মুখ যে, সংযম ও নিবৃত্তির পথে চলিয়া সত্যলাভার্থ জীবন নিয়োগ করিতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই সমর্থ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন, অসংখ্য মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকেই সত্য লাভের জন্য যত্ন করে। 'আহূত হয় অনেকে; কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই', জীশু খ্রীষ্টের এই কথাও তাহার প্রতিধ্বনি। বৌদ্ধ সংঘ ও ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সংঘ—পৃথিবীর এই দুই বৃহত্তম ধর্মসংঘে কালের এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের বিদ্যোৎকর্ষের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত জীবন ও অনুভূতির ভিত্তিতে এক সুবিশাল দর্শন-সৌধ গড়িয়া উঠিবে। ভারতীয় দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ধর্ম-জগতে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে

---

* সন ১৩৪২ সালে ফাল্গুণ মাসে 'মাসিক বসুমতী'র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত

তাহাতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস চিন্তাশীল মনীষিগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং সর্বশাস্ত্রের সার সত্যকে এই অতি মানব স্বীয় সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্ত বিচার সময়োপযোগী বলিয়াই প্রতীত হয়। বিস্তৃত আলোচনার গুরুভার[1] ভবিষ্যতের উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ সাধকের হস্তে ন্যস্ত করিতেছি। সত্য এক ও অদ্বৈত—উহা বেদ ও বাইবেল, কোরাণ ও কাব্বালা, জেন্দাবেস্তা ও গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক ও তাও-তে-কিং সকল ধর্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আর কৃষ্ণ ও ক্রাইষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদ, জেরোয়াস্তার ও লাউৎজে, মহাবীর এবং মোজেস প্রভৃতি ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মাচার্য্যগণ এই সনাতন সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালের উপযোগী করিয়াই প্রচার করিয়াছেন। যেমন হিন্দু ধর্মের মধ্যে সনাতন ধর্ম ও স্মৃতিধর্ম নামক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ অংশদ্বয় আলোচনার সৌকর্য্যার্থ নির্দেশ করা যায়, তদ্রূপ সর্ব ধর্মেই সনাতন ও সাময়িক এই দুই বিভাগ বিদ্যমান। প্রথম অঙ্গ অপরিবর্ত্তনীয় আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সমষ্টি; আর দ্বিতীয় অঙ্গে আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও যুগে এই সনাতন সত্যরাজি যে যে আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক আকার ধারণ করিয়াছে তাহার বিবরণ। সাধারণ মানুষের চিন্তা অত্যন্ত অগভীর বলিয়া সে ধর্মানুষ্ঠানের পশ্চাতে যে গভীর তত্ত্ব লুকায়িত আছে তাহা না দেখিয়া আকারের উপরেই বেশী জোর দেয়। উহার অনিবার্য্য ফল এই ধর্মবিরোধ—যাহা সমাজে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা ও অন্তর্মুখীনতা বৃদ্ধির সঙ্গেই উহা সাধকের মন হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু এই দুনিয়ায় চরম সত্যের সাধক কয়জন আছেন? খাঁটী ধর্মই বা চায় কে? তাই সংসারে ধর্মের নামে এত অধর্ম, বিরোধ, বিদ্বেষ ও হিংসা চলিতেছে। পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রাদেশিক স্বার্থ ও সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সত্যের বিশ্বজনীন ও সার্বভৌমিক স্বরূপ দর্শনের শক্তি অধিক সাধকের নাই।

কার্পেণ্টারের Comparative Religion এবং ফরাসী মনীষীর Comparative Philosophy প্রভৃতি পুস্তক অধ্যয়ন করিলে জানা যায়, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের একটী মৌলিক ঐক্য আছে। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম

জেম্‌স তাঁহার বিখ্যাত Verities of Religious Experience নামক পুস্তকে নানা দেশের আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্মানুভূতির প্রকার-ভেদ থাকিলেও উহা একমেব অদ্বৈত সত্যের আরাধনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। উপনিষদে আছে।

"গবাম্‌ অনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গীনাস্তু গবাং যথা॥

অর্থাৎ গাভীদের বর্ণ অনেক প্রকার হইলেও তাহাদের দুধের বর্ণ একই প্রকার। সাধকদের মানসিক গঠন ও ভাব অনুযায়ী জ্ঞানের ধারণার তফাৎ হয় মাত্র; কিন্তু উপলব্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা একই। হৃদয়-গুহাতে নিহিত ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া মানুষ যখন চরম সত্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত হন তখন তিনি সংকীর্ণ ধর্ম ও শাস্ত্রের ঊর্দ্ধে উত্থিত হন। 'কোন ধর্মের মধ্যে জন্মলাভ করা উত্তম হইলেও উহাতে মৃত্যু অবধি আবদ্ধ থাকা অতীব দুর্ভাগ্য।' এই সাধুবাক্য কত দূর সত্য, তাহা সত্যসাধক মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। চারা গাছের পক্ষে কাঁটার বেড়া সহায়ক হইলেও শেষে ইহা বাধাস্বরূপ হয়। সেইরূপ চরম সত্য লাভের পক্ষে ধর্ম ও শাস্ত্র বন্ধন বিশেষ। শাস্ত্রের সীমার পারে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও উপদেশ দিয়াছেন। ভাগবতে আছে, 'পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থম্‌ অশেষতঃ।' কৃষক যেমন খড়গুলি ফেলিয়া দিয়া ধান্যসংগ্রহ করে সাধক তেমনি শাস্ত্রাতীত হইয়া অনুভূতি লাভার্থ প্রাণপণ করিবেন। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গ্রন্থ ত নয়, গ্রন্থি। সাধক যখন সত্যলাভ করেন তখন তাঁহার জীবনই জীবন্ত শাস্ত্র হয়। শাশ্বত সত্যের উপাসক ও উপলব্ধা সর্বধর্মেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইস্‌লামীয় সুফী, খ্রীষ্টান মিষ্টিক (রাহস্যিক), জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, বেদান্তী, চৈনিক তাওবাদী, মিশরীয় নষ্টিকগণ (gnostics) অদ্বৈত তত্ত্বের বিভিন্ন সাধক। তাঁহারা সকলেই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ও অদ্বৈতবাদী।

যত মত তত পথ; বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন দর্শন একই সত্যলাভের বিবিধ পথমাত্র। প্রস্থান প্রভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থানের পার্থক্য নাই। মহাভারত সত্যই বলিয়াছেন, "দেশ-কাল-নিমিত্তানাং ভেদে ধর্ম বিভিদ্যতে।" ধর্মাচার্য্যগণের

উক্তিগুলি অনুধ্যান করিলে জানিতে পারা যায়, সনাতন সত্য কোন জাতির, কোনধর্মের বা কোন সংঘের একচেটিয়া সম্পদ্ নহে। উহা সমগ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেন, তিনি চিরন্তন সত্যই শিক্ষা দিতেছেন, নিজে নূতন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার পূর্ববর্তী চব্বিশ জন তথাগতের কথা বলিয়া প্রচার করিলেন যে, ভবিষ্যতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণপূর্বক তদনুভূত সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করিবেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "ধর্মাচার্য্যগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সকলেই ঈশ্বরাদেশে একই মহান্ সত্য শিক্ষা দেন।" তিনি আরো বলিয়াছেন, "সর্বশাস্ত্রের মধ্যে কোরাণের উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে।" মক্কা ও আরবের অন্যান্য সহরবাসীদের জন্য তাহাদের ব্যবহৃত আরবী ভাষায় কোরাণ লিখিত হইত, যাহাতে তাহারা সহজে তাঁহার বাণী গ্রহণ করিতে পারে। "বৈদিক ঋষির এই উক্তি একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" হিন্দুধর্মের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৌলানা জালালউদ্দিন রুমীর 'মশনবী' গ্রন্থ মুসলমান জগতে দ্বিতীয় কোরাণের ন্যায় সম্মানিত ও সুপঠিত হয়। তিনি বলেন, কোরাণের মজ্জামাত্র 'মশনবী'তে সংরক্ষিত। "পূর্বাচার্য্যগণের বাণী পূর্ণ করিতেই জীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব, কোন ধর্মের অনিষ্ট বা ধ্বংস সাধন করিতে নহে।"—এই কথা তিনি স্বীয় মুখে স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রগত ভাষা ও বাক্যের বৈচিত্র্য বাদ দিলে ভাবের সাম্য পরিলক্ষিত হয়। এক সুফী কবি বলিয়াছেন যে, অসংখ্য তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের মধ্যে একই সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের পরিভাষা যদি এক ভাষায় অনূদিত হয় তখন উহাদের পশ্চাতে ভাবের সাদৃশ্য ও ঐক্য আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। আল্লা হো আকবর ও মহেশ্বর, কাদির ও ভগবান্, রহিম ও শিব, রহমান ও শঙ্কর, আহুর মজদা ও অসুর মহান্, বুদ্ধ ও ক্রাইষ্ট একার্থবাচক। একই সত্যের হকিকত, নসিস (Gnosis), জ্ঞান, তাও, আইনসফ, ব্রহ্ম, বোধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম নানা দেশে প্রচলিত। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির নিয়ম ; কিন্তু অনন্ত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে অপরিচ্ছিন্ন শাশ্বত ঐক্য আছে তাহা না দেখিলে জীবনে ও সমাজে অশান্তির উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী। চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, তাও

ধর্ম ও কংফুচের ধর্ম পরম সদ্ভাবে বাস করে। চীন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনজন পথিক মিলিত হইলে একজন অন্যের ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকে, "ধর্ম বহু, জ্ঞান এক এবং আমরা পরস্পর ভ্রাতা।" শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত বহুরূপীর উপাখ্যান গভীর উপদেশপূর্ণ। বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত ছয়জন অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় আমাদের ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান অপূর্ণ। আখ্যান-বর্ণিত অন্ধদের মধ্যে কেহ হাতীর কাণ, কেহ বা শুঁড়, কেহ বা পেট, কেহ বা লেজ ধরিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের ধর্ম-বিদ্বেষ তদ্রূপ আংশিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুফীদের মধ্যেও এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। একদা একজন পার্শী, একজন তুর্কী, একজন রুমী ও একজন আরববাসী পথ চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বিশ্রামার্থ কোনও বৃক্ষতলে উপবেশন করে। তাহারা কেহ কাহারো ভাষা বুঝিত না। তথাপি তাহারা আকারে ইঙ্গিতে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশপূর্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া আহার্য্য ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা কি আহার্য্য ক্রয় করিবে? আরব এনাব, তুর্কী উজম, পার্শী আঙ্গুর এবং রুমী আস্তাফিলের জন্য চীৎকার করিল; কিন্তু কেহ কাহারো ভাষা বুঝিল না। শেষে আরক্তিম লোচন ও বদ্ধ মুষ্টি লইয়া তাহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। জনৈক ফল-বিক্রেতা নানা দেশের লোকের নিকট ফল বিক্রয় করিত বলিয়া নানা ভাষায় দুই চারিটী কথা জানিত। সে বিবদমান পথিকদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সংঘর্ষের কারণ জানিল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদের চারি জনের হাতে একই ফল দিল। উহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। আরবী এনাব, তুর্কী উজম, ঈরানী আঙ্গুর, রুমী আস্তাফিল, পহলবী দাখ, সংস্কৃত দ্রাক্ষা, এবং ইংরাজি গ্রেপ শব্দ একার্থ বাচক। ধর্মজগতের দ্বন্দ্বসমূহও এইরূপে হয় অজ্ঞান-প্রসূত, না হয় স্বার্থ-প্রণোদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, একই জলাশয় হইতে জল লইয়া লোকে ওয়াটার, একোয়া, পাণি, জল প্রভৃতি নাম দেয়। ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যানেও এইরূপ বৃথা দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক ধর্ম মানব মনের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি অনুযায়ী

সত্যলাভের তিন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদিক জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি মার্গ ও কর্ম মার্গ, ইসলামের হকিকত ও তারিখত ও শারীয়াত, ঈশাহি ধর্মের নসিস ও পাইটাস ও এনার জাইয়া, বৌদ্ধ ধর্মের সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প ও সম্যক্ ব্যায়াম—এই তিন ধর্ম-পথ। জৈন শাস্ত্র তত্ত্বার্থসূত্রের বচন—'সম্যক্ দর্শন-জ্ঞান-চারিত্র্যানি মোক্ষ-মার্গাঃ।' কাশীধামের ডাঃ ভগবান দাস এম. এ., পিএইচ.ডি তাঁহার গবেষণাপূর্ণ "Essential Unity of All Religions নামক পুস্তকে বলেন যে, সর্বং ত্রৈরাশিবৎ গতিঃ"—এই শাস্ত্রবাক্য গণিতের ন্যায় ধর্মে ও দর্শনে সমান ভাবে প্রযোজ্য। মানুষ, জগৎ ও ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বালোচনায় সমগ্র দর্শন পর্য্যবসিত। সমন্বয়-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার তপস্যাময় জীবনে দেখাইয়াছেন, অদ্বৈত অনুভূতিই ধর্ম ও দর্শনের শেষ কথা। কেবল ধর্মশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা এই সত্য ধারণা করা সম্ভব হইবে না। জীবই ব্রহ্ম—ইহা বৈদান্তের সার সত্য; কিন্তু বেদান্তের এই মহাবাক্য সকল শাস্ত্রেরই শ্রেষ্ঠ বাণী। নিউ টেষ্টামেণ্টে জীশু খ্রীষ্ট কথিত I and my Father are one, ওল্ড টেষ্টামেণ্টর I (Self) am God and there is none else, বেদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সুফীর 'আনাল হক্' অদ্বৈত জ্ঞানের দেশভেদ বর্ণনা মাত্র। পার্শী ধর্মগ্রন্থ আহুর মাজদ ইয়াস্তের বাক্য, আমার প্রথম অহমি (সংস্কৃত অস্মি) বেদান্তের প্রতিধ্বনি। বুদ্ধত্ব লাভ বা ধর্মকায়ের সহিত মিলন মহাযানী বৌদ্ধের আদর্শ। মহাযান, বেদান্ত ও তাসাউফের দার্শনিক তত্ত্বের এত সাদৃশ্য আছে যে, অন্য ভাষায় প্রকাশ করিলে তিনটিকে এক বলিয়া মনে হইবে। বৌদ্ধ নির্বাণও বৈদিক সমাধি একই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দুই নাম মাত্র। উপনিষদুক্ত সমাধির নিম্নোক্ত বর্ণনা অনেকেই জানেন।—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

ভগবান বুদ্ধদেব 'উদান' নামক পালিগ্রন্থে নিব্বাণের যে সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন তাহা প্রায়শঃ একরূপ। তিনি বলেন—

যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি
ন তত্থ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি।
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি
যদা চ অত্তনো বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো
অথ রূপা অরূপা চ সুখদুঃখা প্পমুচ্চতি॥

এই দুই বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন একই অনুভূতি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। ইহুদী, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ঋষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সত্যদর্শনের বর্ণনাসমূহ উক্তপ্রকার। সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব বেদান্তে যেরূপ চরম সীমা অবধি বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোন দর্শনে তদ্রূপ হয় নাই। কাজেই বেদান্তকে ধর্ম ও দর্শনের পূর্ণ পরিণতি বলা যায়। সুবিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Reign of Religion in Contemporary Philosophy নামক পুস্তকে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মতবাদের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই তাঁহাদের দার্শনিক অনুশীলন অদ্বৈতবাদে পৌঁছিতে পারে নাই। যদি প্রত্যেক ধর্মকে বা দর্শনকে যুক্তির ভিত্তিতে পরিবর্ধিত করা হয় তবে নিশ্চয়ই প্রত্যেকে বেদান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। জার্মান দার্শনিক পল ডয়সন তাঁহার Elements of Metaphysics নামক পুস্তকে কাণ্ট ও শংকরের দর্শনদ্বয় তুলনা করিয়া এই মহাসত্যই সমর্থন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ কর্তৃক হিন্দু দর্শনের তিন ভিন্ন স্তর স্বীকৃত। এইরূপ স্তরত্রয় অন্যান্য দর্শনেও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও অবতার পারমার্থিক সত্যের এই তিন প্রকার ভেদ অন্যান্য ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধর্মকায়, নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায়, বাইবেলের গড দি ফাদার, গড দি হোলি ঘোষ্ট এবং গড দি সান একই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও তাওধর্মেও ভগবানের নিরাকার ও সাকার রূপ ও অবতার উল্লিখিত। এই

... প্রকার ঈশ্বর তত্ত্বের দিক দিয়া বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, ও আরম্ভবাদ নামক তিনরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব উৎপন্ন। সেমিটিক ধর্মত্রয়ে আরম্ভবাদের অধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। বেদান্তের মত বৌদ্ধ ধর্ম, প্লটিনাস, কাণ্ট, প্লেটো প্রভৃতির দর্শনে বিবর্তবাদ গৃহীত ও ব্যাখ্যাত। রামানুজের পরিণামবাদই হেগেল, বার্গশোঁ প্রভৃতি দার্শনিকের প্রতিপাদ্য দর্শন। মানব মন এমন একদেশদর্শী যে, কোন তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ভাবনা সে করিতেই পারে না। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি তাহাকে এত ঘেরিয়া রাখিয়াছে যে, ধর্ম ও দর্শনের আচার্য্য-গণও ইহা হইতে মক্ত নহেন। দার্শনিকগণ এক একটী অংশের উপর এত জোর দিয়াছেন যে, মুল তত্ত্বের অন্যান্য অঙ্গসমূহ পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কোন দর্শন বা ধর্মের সর্বাঙ্গ সমৃদ্ধি বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোন দর্শনে সম্ভব হয় নাই। কাউণ্ট কাইসারলিং তাঁহার Travel Diary of a Philosopher, Corrective Understanding প্রভৃতি সারগর্ভ পুস্তকে তুলনামূলক গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যাঁহার মন যে ভাব-ভূমিতে অবস্থিত তিনি সেই স্থান হইতে তদনুরূপ পারমার্থিক সত্যের আভাস পাইয়া থাকেন। বর্তমান যুগে যে Scientific mentalism এডিংটন, জিন্‌স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন তাহা বৈদান্তিক বিবর্তবাদের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

কর্মবাদ বা পুনর্জন্মবাদও ধর্মতত্ত্বের একটী অচ্ছেদ্য অঙ্গ। উহাকে বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের মেরুদণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় ধর্ম হইতে এই কর্মবাদ সমগ্র এশিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে যাহা Progress, Evolution এবং Phylogenisis নামে পরিচিত তাহা এই কর্মবাদের বৈদেশিক প্রতিধ্বনি। Psychic Research নানা ভাবে কর্মবাদ প্রমাণ করিতে যাইয়া আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। জগৎপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পদার্থবিদ্যাবিৎ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক তাঁহার On Education নামক গ্রন্থে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা উল্লিখিত। কর্মবাদে অবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস যে, মানব আত্মার প্রাগভাব ছিল। তাঁহার শিশু পুত্রের অস্তিত্ব জন্মের পূর্বে ছিল না, ইহা বুঝাইতে যাইয়া তিনি মহামুস্কিলে পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার শিশু পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, প্রাচীন যুগে যখন মিশরে পিরামিড প্রভৃতি নির্মিত হইতেছিল তখন সে কি করিতেছিল? এইরূপে শিক্ষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণায় অগ্রসর হইয়া কর্মবাদের সাহায্য ব্যতীত মনীষিগণ আজ অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। থিয়জাফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তৎপ্রণীত Secret Doctrine নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইসলাম, খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্মাদিতে কর্মবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের মতোপকার সংশোধন করিয়াছেন। এই তিন ধর্মই বিশেষ রূপে পুনর্জন্মবাদে আবিশ্বাসী। অবশ্য বাইবেলে এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা দ্বারা উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। জিশু খ্রীষ্ট এক স্থানে বলিয়াছেন, প্রফেট ইলাইজাই জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট রূপে অবতীর্ণ। জিশু খ্রীষ্টের সমসাময়িক ইহুদীগণ কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মে ইহার প্রচলন ছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট জাষ্টিনিয়ান চার্চ কাউন্সিলের বিশেষ সাইনড করিয়া মধ্য যুগে উহা বন্ধ করিয়া দেন। "মানুষ যাহা করে তাহার ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়।"—সেণ্ট পলের এই বচন কর্মবাদের এক মূল সূত্র। জিশু খ্রীষ্ট স্বয়ং বলিয়াছিলেন, ইব্রাহামের পূর্বেও তিনি ছিলেন। তিনি আরো প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আবার ধরাধামে আসিবেন এবং তাঁহার পদানুগগণকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন। মানবাত্মা দেশাতীত কালাতীত নিমিত্তাতীত অজর অমর জন্মহীন সত্তামাত্র। ইহাই কর্মবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সেণ্ট পল eternal life (শাশ্বত জীবন) বাক্যে আত্মার অমরত্বই ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীসে ও প্রাচীন পারস্যে উক্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল। পাইথাগোরাস ও তৎশিষ্যবৃন্দ আত্মার অমরত্ব ও অজরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মসনবী ও তাসাউফ প্রভৃতি মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমী প্রমুখ সুফীগণ বলেন, আত্মা মানুষ, পশু, উদ্ভিদ ও জড় শরীর গ্রহণ করেন। এই চারি প্রকার শরীর ধারণকে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে নাকুস, মাকুস, ফাকুস ও রাকুস বলিয়া অভিহিত করিতেন।

জালাল উদ্দিন রুমী বলেন, "ঘাসের মত আমি শত শত বার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি। জড় ভূতের শরীর ছাড়িয়া আমি পরে বৃক্ষরূপে জন্মলাভ করি। ইহা নষ্ট হইলে পশু জন্ম ও সর্বশেষে নর জন্ম পাইয়াছি। মৃত্যুর পরে আবার দেবদূত বা দেবতা হইব। তাহার পর জন্ম ও মৃত্যুর অতীত হইয়া অনন্ত অসীম আল্লার সহিত মিলিব।" ব্রহ্মজ্ঞ বেদান্তীর উক্তিবৎ ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এরূপ বিশাল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ব্যতীত বিশদ আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং আর দুই একটী কথা উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াই ইহার উপসংহার করিব। Religion, ধর্ম ও ইসলাম প্রভৃতিকে পরস্পরের প্রতিশব্দ বলিলে ভুল হইবে না। সকল ধর্মেই জীবন্মুক্ত বা পরমহংস অবস্থা লাভের কথা আছে। অর্হৎ, তীর্থঙ্কর, মদিওমাম, মেসাইয়া প্রভৃতি শব্দ একার্থ বোধক। মধ্যাবৃত্তি অনুসরণার্থ প্রত্যেক ধর্ম নির্দেশ দিয়াছেন। বুদ্ধ দেবের মঝ্ঝিম প্রতিপদা, মহাবীরের অনেকান্তবাদ, কংফুচের গোল্ডেন মীন (golden mean) প্রভৃতি মধ্য পন্থা (middle path) গ্রহণেরই উপদেশ। প্রত্যেক দর্শন ঈশ্বরকে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লাওৎজে, চুয়াংজু প্রভৃতি চৈনিক ঋষির ইয়াং এবং ইয়েন শব্দ দ্বারা উক্ত ভাব সূচিত। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেন, "ঈশ্বর দিবারাত্রি, গ্রীষ্ম-শীত, সুখ-দুঃখ, অভাব-পূর্ণতা এই সবই।" হিন্দু ধর্ম ও ইসলামে প্রদত্ত ভগবানের নাম হইতে এই ভাবটী আরো পরিস্ফুট হয়। যথা—ঈশ্বর আদি ও অন্ত—আল আওয়াল ও আল আখির, অব্যক্ত ও ব্যক্ত—আলবাটিন ও আজ-জাহির, স্রষ্টা ও সংহর্তা—আলবাদী ও আলজামি, ভব ও হর—আল মুহিয়া ও আলমুমিৎ, মাই ও তারক—আলমুজিল ও আলহাদী, রুদ্র ও শিব—আলকোয়াহার ও আররাজ্যক, যম ও ক্ষমাবান্—আলগাজাব ও আলগাফির, ঘোর ও দয়ালু—আলজাবার ও আলকরিম, শাস্তা ও প্রভু—আলজলিল ও আলজামিল ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মই ভগবানের অসংখ্য নাম ও রূপ দিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম প্রত্যেক মানুষের জন্য এক এক ইষ্ট দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে।

সত্যলাভের জন্ম অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতির প্রয়োজনীয়তা সর্ব দেশে স্বীকৃত। তবে সেমিটিক ধর্মে শ্রুতি, বৌদ্ধ ধর্মে যুক্তি, এবং বেদান্তে তিনটীর উপর সমান জোর দেওয়া হইয়াছে। বেদ যাহাকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্য বলে, ত্রিপিটকে তাহাকে সম্যক্ সম্বোধি ও সংবৃত্ত সত্য বলে। হিন্দু যোগ, মুসলমান সুলুক, বৌদ্ধ জেন প্রভৃতি অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক উপায় সর্বশাস্ত্রে গৃহীত। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিৎ সি. জে. ভুঙ্গ তাহার Secret of the Golden Flower নামক পুস্তকে চীন দেশীয় যৌগিক মনস্তত্ত্ব গবেষণার আলোকে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগবিজ্ঞান অল্প-বিস্তর সকল ধর্মসম্প্রদায়ই অভ্যাস করে। তিনি বলেন, মনজয়ের এরূপ সুগম ও অমোঘ উপায় আর নাই বলিলেই চলে। এমন কি, প্রাণায়ামের প্রচলন বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম এবং ইওরোপের মিষ্টিকগণ চিত্তসংযমের জন্য অভ্যাস করিতেন। বৌদ্ধ যোগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা জাপানী পণ্ডিত জি. টি. সুজুকি Zen Buddhism নামক তিনটী বৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের অন্য নাম মায়াবাদ। মায়াবাদী বেদান্তীদিগকে দেশবিদেশে অনেকে কটাক্ষ করেন; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানেন যে, মায়াবাদ সর্বধর্মেই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। সৃষ্টির যে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ উহা অনির্বচনীয়। প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ, শঙ্করাচার্য্য, নাগার্জুন, গৌড়পাদ প্রভৃতি এবং প্রতীচ্যের আইনষ্টিন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, ক্যাণ্ট, সোপেনহাওয়ার প্রভৃতি মনীষিগণ মুক্ত কণ্ঠে উহা স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুর স্বর্গ ও নরক, মুসলমানের জাহান্নাম ও বাহেস্তা, খ্রীষ্টানের প্যারাডাইস ও পার্গেটারী প্রভৃতি শব্দে জীবের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন গতি বর্ণিত। সর্বধর্মই মানুষের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অস্তিত্ব মানিয়া লয়। বেদান্তের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে জৈন ধর্মে ঔদারিক ও তৈজস ও কর্মজ শরীর, খ্রীষ্টীয় মিষ্টিসিজমে (রহস্যবাদে) বডি ও সোল ও স্পিরিট, ইহুদী সাধুগণ নেফেস ও রুয়া ও নেসামা, মুসলমানগণ সুফীগণ নাফস ও দিল ও রুহ বলেন। সর্বভূতে আত্মানুভূতিই

সকল ধর্ম ও দর্শনের আদর্শ। জৈনাচার্য্য শুভচন্দ্র তাঁহার 'জ্ঞানার্ণব' গ্রন্থে বলেন, "তৎ শ্রুতং তচ্চ বিজ্ঞানং তৎ ধ্যানং তৎপরং তপঃ, অয়মাত্মা যদাশান্ত স্বস্বরূপে লয়ং ব্রজেৎ।" নিজ আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে হয়, এই বিষয়ে সর্বশাস্ত্র একমত।

নানা শাস্ত্রে শুধু ভাবের নয়, ভাষারও এমন সাদৃশ্য আছে যে, এই সবের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিলে অবাক্ হইতে হয়। উপনিষদে আছে, নেদং যদিদং উপাসতে। তদ্রূপ মিশরেও এই শাস্ত্রবাক্য প্রচলিত আছে, Whatever degree your mind comes at, I tell you flat God is not that. ডাঃ এবেল্‌শন তাঁহার Jewish Mysticism গ্রন্থে ইহুদী শাস্ত্র জোহরেও এইরূপ বাক্য আছে বলিযা উল্লেখ করিযাছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে জগতের সর্বধর্মাবলম্বী যদি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত সমন্বয়-বাণীর অনুধ্যান করেন তবেই এই উৎসব সফল হইবে। জগতের ঐক্য স্থাপনের জন্য ফরাসী বিদ্রোহ, রুশ বিদ্রোহ ও লীগ অব নেশন (জাতিপুঞ্জ) ব্যর্থকাম হইয়াছে। জগতের সাম্য স্থাপন করিতে মানবের চিন্তা-জগতে সমন্বয় সর্বপ্রথম আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অপূর্ব সমন্বয় নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন। সাম্য ও শান্তির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই ধর্মরাজ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার বাণীর আলোকে সকল ধর্মের ও সকল শাস্ত্রের ও সকল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং তত্ত্ব পরিস্ফুট। সারা জীবন সর্বধর্ম ও সর্বদর্শন কিঞ্চিৎ চর্চা করিয়া দেখিযাছি, তাঁহার বাণী কত সত্য! সকল শাস্ত্রকে নিজ শাস্ত্রবৎ বিশ্বাস করা, সকল ধর্মকে নিজ ধর্মতুল্য শ্রদ্ধা করা, এবং সকল অবতারকে স্বীয় ইষ্টদেবতার মত ভক্তি করাই ধর্মজীবনের প্রথম কর্তব্য। তাহা যিনি করিতে পারিবেন তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান যাহাই হউন না কেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের খাঁটী ভক্ত; অন্য সকলে তাঁহার অবমাননা করেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়ই ভারতের প্রকৃত সাধনা ও সিদ্ধি।

বর্তমান যুগে ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ। ভগবান বুদ্ধের মাধ্যমে ভারত-শক্তি সমগ্র এশিয়াকে এক সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। তাহার

ফলে ভারতে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্ম প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর তপস্যা ও সাধনায় এবং সপ্রেম আহ্বানে আবার ভারতের সনাতনী মহাশক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া লোক-সংগ্রহে ব্যাপৃতা। বর্তমান ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মবৎ ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত সমন্বিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বেদ অভীপ্সিত সমন্বয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পৃথিবীময় যে ধর্মসমন্বয়ের মহাবন্যা আসিবে ভারতে উহার লক্ষণ পরিস্ফুট। চক্ষুষ্মান ইতোপূর্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি দেখিতেছেন না তাহাকে স্থূল চক্ষু বন্ধ করিয়া মানস নয়নে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বেদ অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি।

সাত

কালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

সন ১৩৬০ সালের ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার। বেলুড় হইতে বাসে হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া পৌনে একটায় আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে উঠিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ৩৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বৈকাল ৪টায় গুপ্তিপাড়া ষ্টেশনে নামিলাম। গুপ্তিপাড়া পরিব্রাজক স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান। এখান হইতে চলিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে দেড় মাইল দূরে সাতগাছিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌছিলাম। পরদিন শনিবার উক্ত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। আমি পূর্বাহ্নে ঠাকুরের পূজা ও হোম করিলাম এবং বৈকালে আশ্রম প্রাঙ্গনে আহূত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দিলাম। তৎপর দিবস উক্ত স্থানে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায় শ্রীসারদা দেবীর লীলা-কাহিনী মৎকর্তৃক আলোচিত হইল। ২৪শে ফাল্গুন সোমবার কালনা টাউন হলে মীরাবাইয়ের ভজনাবলী সম্বন্ধে কথকতা করিলাম।

কালনা বঙ্গদেশের মন্দিরময় তীর্থস্থান এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিত। বাংলার দুই অবতার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পাদস্পর্শে উক্ত স্থান তীর্থীভূত। তাই এই পুণ্যতীর্থ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা গত পাঁচ বৎসর হৃদয়ে বলবতী ছিল। ২৮শে ফাল্গুণ বুধবার প্রাতে কালনা দর্শনে বহির্গত হইলাম এবং দুই মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া শহরের সমীপে গেলাম। শহরের সীমান্তে মজলি সাহেবের দরগা ও দীঘি ও ভগ্ন মসজিদ। এই স্থানের নাম দাঁতন কাঠি তলা। প্রবাদ আছে যে, সিদ্ধ পীর মজলী সাহেবের দাঁতন কাঠি হইতে একটী বৃহৎ বটগাছ উৎপন্ন হয়। সেই বট গাছ অদ্যাপি বর্তমান। উহার শিকড় ও শাখাপ্রশাখা এক ফার্লং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এরূপ প্রাচীন ও প্রকাণ্ড বটগাছ অত্যন্ত বিরল। এই বটগাছের তলায় মজলি সাহেবের কবর ও অদূরে বৃহৎ দীঘি। দীঘির পাড়ে প্রত্যেক বৎসর বড় মেলা হয়। উল্লিখিত মসজিদ প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পুরাতন। উহার ১৮টী প্রস্তর স্তম্ভ ও তদুপরি ইষ্টক নির্মিত খিলান আছে। উহার একটি লম্বা প্রস্তরে শিলালিপি খোদিত এবং কোন কোন অংশ কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত।

কালনার পূর্ব নাম অম্বিকা। লালবিহারী দে প্রণীত ইংরাজী পুস্তক Bengal Peasent's Life (বাঙ্গালী কৃষকের জীবন) এ অম্বিকা নামই দেখা যায়। এখনও রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম অম্বিকা কালনা। কালনা নামটী কিরূপে প্রচলিত হইল, এই সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবীণদের অভিমত যে, ইংরাজ বণিকগণ নৌকায় আসিয়া গঙ্গাগর্ভস্থ অধুনালুপ্ত কালনা গ্রামে উঠেন। তদবধি অম্বিকাকে কালনা বলা হয়। সুতরাং কালনা নাম ইংরাজগণ কর্তৃক প্রচলিত। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অম্বিকা বলিয়া ইহার নাম অম্বিকা। অম্বিকা দেবীর মন্দির ও তন্মধ্যস্থ চতুর্ভুজা কালীমূর্তি দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মার্শম্যানের History of Bengal এ অম্বিকা সহরের প্রাচীন বর্ণনা আছে। অম্বিকা দেবীর মূর্তি নিম্বকাষ্ঠে নির্মিত। পূর্বে নিম্ব কাষ্ঠের দেবমূর্তি নির্মাণ বাংলায় প্রচলিত ছিল। অম্বিকা মন্দিরের ইষ্টকময় কারুকার্য্য অতিশয় চমৎকার। এই মন্দির প্রাঙ্গণে চারটী শিব মন্দির আছে। শোনা যায়, প্রায়

দুই শত বৎসর পূর্বে অম্বিকা মন্দির বর্দ্ধমান মহারাজা কর্তৃক নির্মিত হয়। মহামুনি অম্বরীশ এই স্থানে শাক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। নিশ্চয়ই অম্বিকা তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন। বাংলার কল্যাণেশ্বরী, হংসেশ্বরী, ক্ষিপ্তেশ্বরী ও অম্বিকা মন্দির চতুষ্টয় সম্ভবতঃ সমসাময়িক। যখন বাংলায় শাক্ত সাধনার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয় তখন এই সকল মন্দির নির্মিত। সাধক কমলাকান্তের জন্মস্থানও কালনা।

কালনায় আর এক দর্শনীয় স্থান ভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম। এই আশ্রমে ভগবানদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগমন করেন। ভগবানদাস উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাতে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর গঙ্গাতীরস্থ কালনাধামে সাধনা করেন ও সিদ্ধ হন। সন ১২৯০ সালে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। তাঁহার স্থূল দেহ তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষে সমাহিত করা হইয়াছে। উক্ত কক্ষে তাঁহার একটী প্রস্তর বিগ্রহ এবং তৎব্যবহৃত বিছানা কাঁথা ও খাট সংরক্ষিত। কক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা অনুভব করিলাম, বৈষ্ণব সাধকের সাধনার পূত প্রভাব এখনও তথায় ঘনীভূত। বহু দেশ ভ্রমণান্তে ভগবানদাস বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীপাট অম্বিকায় আসেন এবং সুপ্রসিদ্ধ গৌর নিতাই মন্দিরের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হন। তথায় দাঁড়াইয়া তিনি ভক্তি-ভরে বলিলেন "দ্বার খুলিয়া ত সব জায়গায় দর্শন দেওয়া হয়। আপনা আপনি দ্বার খুলিয়া কি কোথায়ও দর্শন পাওয়া যায় না?" সিদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা উচ্চারিত হইবা মাত্র অদ্ভুত উপায়ে মন্দিরের সম্মুখস্থ দরজা খুলিয়া গেল। ভগবান্‌দাস মহোল্লাসে দেব-দর্শন করিলেন। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা তিনি পূর্বে কোথাও দেখেন নাই। তাই তিনি বাকী জীবন কালনায় কাটাইবার সংকল্প করিলেন। উল্লিখিত মন্দিরের 'গিরিধর' পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে ২।৪টী ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। সাধু-ভক্ত কেহ কেহ তথায় মাঝে মাঝে আসিয়া কিছু দিন থাকিতেন। ভগবান্‌দাস একটী কুটীরে অবস্থান ও মন্দিরের প্রসাদ পাইতে

লাগিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই মন্দিরের অন্নপ্রসাদ ব্যতীত অন্য অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে কুটীরে থাকিতেন তাহার কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ এখনো দেখা যায়। তিনি প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে লক্ষাধিক হরিনাম জপ করিতেন। তিনি যখন নিদ্রা যাইতেন তখনো তাঁহার জিহ্বা হইতে উচ্চারিত হরিনাম লোকে স্পষ্ট শুনিতে পাইত। তাঁহার হাতের দশ আঙ্গুল নামজপে এত অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, সর্বদাই উহারা স্বতঃই সঞ্চালিত হইত। তিনি কখনো কাহারো প্রণাম গ্রহণ করিতেন না। যখন তিনি রাস্তায় চলিতেন তখন তাঁহার গাত্রস্থ কাঁথা পশ্চাতে মাটিতে লুটাইযা চলিত এবং রাস্তার ধুলায় তৎপদচিহ্ন মুছিয়া দিত। পাছে কেহ তাঁহার চরণ চিহ্ন হইতে পদরজঃ গ্রহণ করে এইজন্য তিনি উক্ত প্রকারে চলিতেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গা পর্যন্ত যাইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেন এবং ফিরিবার সময় গঙ্গা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইযা পশ্চাতে হাটিযা চলিতেন। গঙ্গাকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি কখনো চলেন নাই। গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিবার ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই বলিতেন, "গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি।"

কিছুকাল অম্বিকায় অবস্থানের পর বাবাজীর মনে দেবসেবার ইচ্ছা জাগিল। কি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন, এই চিন্তায় যখন তিনি মগ্ন ছিলেন তখন তিনি দেবাদেশ পাইলেন, "নামই ব্রহ্ম। অতএব নাম ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা কর।" ভগবান্‌দাস মোচকন্দ কাঠের উপর 'হরেকৃষ্ণ' নাম খোদিত করাইয়া উহা স্বীয় আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বিকা বাজারের পশ্চিমে কিছু জমি সংগ্রহ-পূর্বক তথায় ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ ও তন্মধ্যে তিনি 'নাম ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত নাম ব্রহ্ম এখনো তাঁহার আশ্রমে নিত্য পূজিত হইতেছে। মন্দির নির্মাণের পর তিনি পূর্ব কুটীর ছাড়িয়া মন্দিরের পার্শ্বস্থ কুটীরে দীর্ঘকাল বাস ও তথায় দেহরক্ষা করেন। তাঁহার তিরোভাবের পর তৎশিষ্য বিষ্ণুদাস বাবাজী উক্ত মন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত হন। ভগবান্‌দাসের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ

আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র শুনিলেন, ধ্যানস্থ বাবাজী হেট্ হেট্ শব্দ করিয়া উঠিলেন। ইহা শুনিয়া মহারাজ ভাবিলেন, "আমার মত বিষয়ীর সঙ্গ পছন্দ না করিয়াই বাবাজী বোধ হয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।" মহারাজ দুঃখিত অন্তরে চলিয়া যাইতেছিলেন। বাবাজীর ধ্যানভঙ্গের পর উপস্থিত ভক্তগণ তাঁহাকে মহারাজের আগমনের সংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমি মহারাজের আগমনের বিষয় কিছুই জানি না। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে তুলসী গাছ আছে তাহা ছাগলে খাইতেছিল বলিয়া আমি সেই ছাগল তাড়াইতে গিয়াছিলাম।" তৎক্ষণাৎ এই কথা মহারাজকে জানান হইলে তিনি বৃন্দাবনে তার করিয়া অবগত হইলেন, বাবাজীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। উক্ত মন্দিরস্থ পূজারী দেখিয়াছিলেন, এক বৃদ্ধ বাবাজী সেই ছাগল তাড়াইয়াছেন; কিন্তু সেই বাবাজীকে তাঁহারা পূর্বে কখনো দেখেন নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করেন তখন খ্যাতনামা বাবাজীর বয়স আশী বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। এক স্থানে বসিয়া দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় জপধ্যান করার জন্য শেষ দশায় তাঁহার পদদ্বয় অসাড় ও অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কাছে যিনি যাইতেন তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যার প্রভাবে অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিতেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে তাহার এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে, তাঁহার নির্দেশ দেববাক্যতুল্য সমাদৃত হইত। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন বৈষ্ণবগণ তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিতেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণব তাঁহার নির্দেশ শিরোধার্য্য করিতে পারিলে ধন্য মনে করিতেন।

কলিকাতার কলুটোলা পল্লীতে একটী হরিসভা ছিল। তথায় ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন করার সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য একটী আসন পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া রাখা হইত। সকলে ভক্তিভরে উহার সম্মুখে প্রণাম করিতেন এবং ইহাতে কখনো কাহাকেও বসিতে দেওয়া হইত না। একদিন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ তথায় ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত

হইয়া ভাগিনেয় হৃদয়রাম সহ তথায় উপস্থিত হন এবং দেখেন, সকলে তন্ময় হইয়া ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি তদ্দর্শনে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এক কোণে বসিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে পাঠক ও শ্রোতৃ-মণ্ডলীর ভক্তিভাব শত গুণে সজীব হইয়া উঠিল। অমৃতোপম ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীচৈতন্যাসনের দিকে ছুটিয়া যাইয়া উহার উপর দাঁড়াইয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও হাস্যোদ্ভাসিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিসমূহে যেমন ঊর্দ্ধোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলি নির্দেশ থাকে তদ্রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে অঙ্গসংস্থান দৃষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া অনেকে বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের ভাবে সমাবিষ্ট ও সমাহিত। পাঠক পাঠ ভুলিয়া সমাধিস্থ পরমহংসের দিকে তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শ্রোতৃবৃন্দও অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে কিছুক্ষণ অভিভূত থাকিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার মন দেহ-ভূমিতে কিঞ্চিৎ নামিল। যখন দেহে কিঞ্চিৎ হুঁশ আসিল তখন তিনি ভক্তদের সহিত উদ্দাম মধুর নৃত্য করিলেন। আবার যখন ভাবাতিশয্যের দুর্নিবার তোড় আসিল, তখন সমাধিস্থ হইয়া স্থির নিশ্চল রহিলেন। কীর্তনান্তে ঠাকুরের দিব্য ভাব প্রশমিত হইল এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভাগবত ভাবাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যাসন গ্রহণ করায় গোঁড়া বৈষ্ণবগণ সমালোচনা ও প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই বিষয় লইয়া বৈষ্ণব সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কোন অজ্ঞাতনামা পরমহংস কর্তৃক চৈতন্যাসন অধিকৃত হইয়াছিল শুনিয়া ভগবানদাস বিরক্ত ও কুপিত হইয়া কটূক্তি করিলেন। উক্ত ঘটনার অল্প দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বতঃপ্রেরিত হইয়া ভাগিনেয় হৃদয়রাম এবং কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক মথুরানাথকে লইয়া গঙ্গাপথে কালনায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে তাঁহাদের নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিলে মথুরানাথ বাসার ব্যবস্থা করিতে গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়রামকে

সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে বাহির হইলেন এবং লোকমুখে সংবাদ শুনিয়া ভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রমে গেলেন। কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট যাইবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ অব্যক্ত সঙ্কোচে অভিভূত হইতেন। তাই তিনি সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া হৃদয়রামের পশ্চাতে পশ্চাতে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পদার্পণ করিতেই ভগবান্ দাস সমবেত ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, "আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে।" ইহা বলিয়া বাবাজী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও দেখিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবাজীকে প্রণামান্তে হৃদয়রামের সহিত দীন ভাবে বসিলেন। বাবাজীও প্রতিনমস্কারপূর্বক তাঁহাকে নাম-ধামের প্রশ্নাদি করিলেন। কোন বৈষ্ণব অন্যায় আচরণ করায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বাবাজী বলিলেন, "তোমার কণ্ঠি কাড়িয়া লইয়া সম্প্রদায় হইতে তোমাকে তাড়াইয়া দিব।" এই বাক্য শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। হৃদয়রামের সহিত কথাবার্তার সময়ও বাবাজী জপমালা ফিরাইতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, এখনও আপনি মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন। আপনার পক্ষে উহা রাখিবার প্রয়োজন ত আর নাই।" উক্ত প্রশ্নে বাবাজী পরমে দীনতা প্রকাশান্তে উত্তর দিলেন, "নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য মালা-তিলকাদি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্টাচার হইয়া যাইবে।" বার বার অহঙ্কার প্রকাশ করায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি? তুমি এখনও আবার অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিখাইবে?" তখন শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গাবরণ পড়িয়া গিয়াছে এবং কোমরের কাপড়ও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কয়েকটী কথামাত্র বলিয়াই তিনি ভাবাবিশে

সমাধিমগ্ন হইলেন। নিশ্চেষ্ট নিঃস্পন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে মুহুর্মুহুঃ দিব্য ভাবের বিকাশ দর্শনে বাবাজী বিস্মিত হইলেন এবং তৎকৃত মন্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য সাধক নহেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গের আনন্দ-প্রবাহ ছুটিল। যখন বাবাজী শুনিলেন, ইনি দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস, যিনি কলুটোলার হরিসভায় ভাবাবেশে চৈতন্যাসনে বসিয়া ছিলেন তখন তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণামপূর্বক তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে সেদিন ঠাকুর ও বাবাজীর প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হইল। ঠাকুর বাসায় ফিরিয়া মথুরানাথকে সব কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া মথুরানাথ বাবাজীকে দর্শন করিতে যান এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা ও একদিন মহোৎসবাদির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহীশিষ্য কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভগবান্‌দাস বাবাজীকে ১৮৮৪ খ্রীঃ জুন মাসে দেখিতে যান। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ভগবান্‌দাসের কাছে গিয়েছিলে। কেমন দেখলে?" মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, কালনায় গিয়েছিলাম। ভগবান্‌দাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান। আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি? সেই বাড়ীতে নাম-ব্রহ্মের পূজা হয়।"

কালনায় ছোট দেউড়ীতে আনন্দ আশ্রম একটী দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান। নেপালের মহারাজা রাণা বীরসিং সামসের জং বাহাদুরের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সমগ্র ভারত পর্য্যটনান্তে জ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে সন্ন্যাসিনী হন। তিনি বেদান্ত সাধনায় সিদ্ধ হন এবং কালনায় আশ্রম স্থাপন করেন। উক্ত আশ্রমে কয়েকটী সন্ন্যাসিনী ও কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকেন। পরমহংস জ্ঞানানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার রোমাঞ্চকর সাধনার ইতিবৃত্ত ও উপদেশ

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত আশ্রমে জ্ঞানেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানানন্দজীর অষ্ট ধাতুময় মূর্তি পূজিত হয়। কালনায় পাঁচটী হাই স্কুল ও একটী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ আছে। স্টেশন রোডে ইণ্টার কলেজ, রাজস্কুল ও অম্বিকা স্কুল বিদ্যমান। শহরের এক প্রান্তে মহকুমা হাসপাতাল। ইহা পূর্বে স্কটস মিশনারীদের হাসপাতাল ছিল এবং উক্ত পাদ্রীগণ কর্তৃক একটী মিশন স্কুলও প্রায় ত্রিশ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। এই হাসপাতালে কালাজ্বর ও কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুইর থাকিতেন। এই হাসপাতালের পার্শ্বেই খ্রীষ্টানদের গোরস্থান। এই গোরস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, কালনার বহু হিন্দু নর নারী খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যাহাদিগের মৃতদেহ তথায় কবর দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অনেকের নামসমূহ তথায় লিখিত আছে।

বর্দ্ধমান মহারাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অষ্টাধিক শত (১০৮) শিব মন্দির কালনার আর এক দর্শনীয় দেবস্থান। এক শত আট শিবের একশত আট ছোট ছোট মন্দির দুই বৃত্তাকারে নির্মিত। বহির্বৃত্তে ৭২ মন্দির এবং তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ কৃষ্ণ প্রস্তরের এবং পরবর্ত্তী শিবলিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরের। মধ্য বৃত্তে ৩৬ মন্দির ও তন্মধ্যে ৩৬ শিবলিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত। কেন্দ্রস্থলে একটী কূপ ও উহার চারিদিকে বিল্ব বৃক্ষ। বাহিরে একটী সাক্ষী শিব মন্দির। উহা ১২৫৬ সালে (১৭৭১ শকাব্দে) স্থাপিত এবং সোনামুখী নিবাসী রামহরি মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত। এই সকল শিব মন্দির দর্শন কালে মনে হইতেছিল, যেন শিবলোকে আসিয়াছি। বর্দ্ধমান শহরের অদূরে নবাবহাটে ১০৮ শিব মন্দির মহারাজগণ কর্তৃক নির্মিত। তথায় প্রত্যেক মন্দিরের পশ্চাতে এক এক বেল গাছ আছে। বেল পাতায় শিব পূজা হয়। তাই বেল-বনে শিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। কলিকাতার খিদিরপুর পল্লীতে ভূকৈলাস রাজবাড়ীতেও ১০৮ শিব মন্দির আছে শোনা যায়, লর্ড কার্জনের সময় এই সকল শিবমন্দির নির্মিত। কালনায় ১০৮ শিবমন্দিরের পার্শ্বে বর্দ্ধমান মহারাজাদের অন্যান্য কীর্তি আছে। তন্মধ্যে সুলতান অন্তঃপুর মহল উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৮৭৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের আদেশে পঞ্চু মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত। বর্দ্ধমান

রাজবংশীয় অন্তঃপুর-চারিণীগণ কালনায় আসিলে এই প্রাসাদে থাকিতেন। উক্ত মহলের সম্মুখে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান ও তন্মধ্যে জলের ফোয়ারা এতদ্ব্যতীত রাধাগোবিন্দ মন্দির, রামসীতা মন্দির, নারায়ণ মন্দির, লালজী মন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এই সকল মন্দির গাত্রে ইষ্টকনির্মিত বহু প্রকার পদ্ম, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, রাম-রাবণ যুদ্ধ, ব্রজলীলাদি খোদিত এই সকল দেখিলে বোঝা যায়, বর্তমান কালের ন্যায় প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বেও বাংলায় মৃৎশিল্পের অপূর্ব সমৃদ্ধি হইয়াছিল। লালজী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন মাধবীলতা এবং গোবর্দ্ধন পর্বত নির্মিত অন্নকুটের সময় লালজী গোবর্দ্ধন পর্বতে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার অদূরে একটী প্রকাণ্ড রাসমঞ্চও আছে। তথায় প্রত্যেক বৎসর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হইয়া থাকে। কালনায় গোপাল বাড়ী, অনন্ত বাসুদেব এবং বর্দ্ধমান মহারাজাদের সমাধি মন্দিরও দ্রষ্টব্য। উক্ত সমাধি মন্দির ১২৮৩ শকে স্থাপিত। মহতাব চাঁদ বাহাদুরের মাতা কমল কুমারী দেবী এবং তেজচাঁদ, প্রতাপচাঁদ এবং প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি মহারাজাদের অস্থির উপর এই সকল সমাধি মন্দির নির্মিত।

কালনায় বহু শিবমন্দির, কৃষ্ণমন্দির ও দেবীমন্দির থাকিলেও ইহা প্রধানতঃ বৈষ্ণব তীর্থ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে বহু বার আগমন করেন এবং পণ্ডিত গৌরীদাসের সহিত মিলিত হন। গৌরীদাসের পৈতৃক নিবাস ছিল শালিগ্রামে। তিনি অম্বিকায় আসিয়া এক আমলা (তেঁতুল) গাছতলায় কুটীর নির্মাণ করিয়া নির্জনে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটি বৈঠা কাঁধে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত, আমি শান্তিপুর হইতে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইলাম। এই বৈঠা দিয়া আমি নিজেই নৌকা বাহিয়াছি। এই বৈঠা তোমাকে দিলাম। ইহার দ্বারা তুমি জীবগণকে ভবনদী পার করাও।" এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ইহাতে গৌরীদাস সানন্দে উক্ত বৈঠা মাথায় লইয়া নাচিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে আমলী তলায় বসিয়া বিশ্রাম ও আলাপ করিলেন। আমলী তলায় গৌরীদাস মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে

চাঁপাফুলের মালা পরাইলেন। মহাপ্রভু গৌরীদাসকে নবদ্বীপে লইয়া যান এবং তাঁহাকে তথায় স্বহস্তলিখিত একখানি ভগবদ্গীতা দান করেন। চৈতন্যপ্রদত্ত গীতা ও বৈঠা কালনায় গৌরীদাস মন্দিরে অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে। যে তেঁতুল গাছের তলায় গৌরাঙ্গদেব ও গৌরীদাসের মধুর মিলন হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান। এত বড় তেঁতুলগাছ বাংলায় বিরল। উহার চারি দিকে ইষ্টক-নির্মিত বেদী এবং বেদীর চারি দিকে লোহার রেলিং এর বেড়া আছে। তেঁতুল গাছটি বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত ও বিস্তৃত ছায়াযুক্ত। উহার কাণ্ড অর্ধগোলাকার ভাবে খোলা এবং কাণ্ডের সারাংশ সম্পূর্ণ শুষ্ক ও নীরস। শুধু কাঁচা ছাল সেই শুষ্ক কাণ্ড অবলম্বনে ভূমির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া এই বৃহৎ বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কোন কোন প্রবীণ কালনাবাসীর অভিমত এই যে, আদি আমলী গাছটি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তৎস্থলে বর্তমান আমলী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত।

পণ্ডিত গৌরীদাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিতাই প্রভুকে আর্তি জানাইলেন, "আপনারা আমার বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না। আপনারা সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে গেলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আপনারা চলিয়া গেলে আমি আর প্রাণ রাখিব না।" মহাপ্রভু গৌরীদাসের কাতরতা দর্শনে তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং তাঁহাদের মূর্তিসেবা করিতে তাঁহাকে বলিলেন। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নবদ্বীপে যে নিম্ববৃক্ষতলায় শ্রীচৈতন্য ভূমিষ্ঠ হন গৌরীদাস সেই নিম্ব বৃক্ষের কাষ্ঠ আনাইয়া গৌর-নিতাইয়ের মূর্তিদ্বয় প্রস্তুত করাইলেন। ঈশান নাগর প্রণীত 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ অনুসারে মনে হয়, গৌরীদাস স্বয়ং ভাস্কররূপে এই মূর্তিদ্বয় নির্মাণ করেন। অদ্বৈতপ্রভু নিজে আসিয়া উক্ত মূর্তিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করেন। উল্লিখিত মূর্তিদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া সিংহাসনে বসান হইল গৌর নিতাইয়ের উপস্থিতিতে। অনন্তর প্রভুদ্বয় বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের যাত্রার অব্যবহিত পরেই গৌরীদাস সিংহাসনস্থ বিগ্রহদ্বয়ের সহিত কথা বলিতে গেলেন; কিন্তু বিগ্রহদ্বয় তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না। ইহাতে পণ্ডিত যেন বজ্রাহত হইলেন এবং ভাবিলেন,

"যে বিগ্রহ কথা কহিবে না তাহা লইয়া আমি কি করিব?" প্রভুদ্বয় তখনো গঙ্গাপার হন নাই। তৎক্ষণাৎ পণ্ডিত তাঁহাদিগকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। প্রভুদ্বয় তখন গৌরীদাসের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সহাস্যে বলিলেন. "কি পণ্ডিত। আবার খবর কি?" তখন গৌরীদাস কাতর নিবেদন করিলেন, "আমি এই বিগ্রহ-যুগল চাই না। ইহারা আমার সহিত কথা বলেন না। ঐরূপ বিগ্রহ লইয়া আমি কি করিব? প্রভু, তোমরা দুইজনে থাক ত থাক।" ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, "আমরা থাকলেই হইবে? আচ্ছা, আমরাই রইলাম।" এই কথা বলা মাত্র প্রভুদ্বয় মন্দির-প্রাঙ্গণে স্পন্দহীন দারু-মূর্তিতে পরিণত হইলেন এবং মন্দিরস্থ বিগ্রহদ্বয় সজীব সচল হইয়া বাহিরে আসিলেন। তখন গৌরীদাস উক্ত চারি মূর্তির মধ্যে প্রভেদ করিতে পারিলেন না, কোন মূর্তিদ্বয় দারুময় ও কোন মূর্তিদ্বয় দেহধারী। তখন প্রভুদ্বয় সহাস্য বদনে গৌরীদাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এখন নিজে ত দেখিলে, আমরাও যাহা তোমার দারুমূর্তিও তাহা। আজ আমরা নিজ মুখে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম যে তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন আমরা চাক্ষুস ভাবে তোমার সহিত লীলা করিব। অতএব পণ্ডিত স্থির হও।" কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, পণ্ডিতের প্রতীতির জন্য গৌর-নিতাই মূর্তিদ্বয় তাঁহার নিকট মাগিয়া খাইতেন। সেইদিন গৌরীদাস মহানন্দে উল্লসিত হইয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া চারি মূর্তিকে ভোজন করাইলেন এবং পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র-তাম্বুলাদি দিয়া সেবা করিলেন। গৌর-নিতাইয়ের স্বয়ম্ভু মূর্তিদ্বয় শ্রীপাট অম্বিকায় অদ্যাপি বিরাজমান। যখন নীলাচলে মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন তখন কেবল এই গৌরীদাস মন্দির ব্যতীত অন্য কোথাও মহাপ্রভুর দারুমূর্তি ছিল না।

আমরা পদব্রজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালনা তীর্থ দর্শন করিলাম। পরদিন সাতগাছিয়া হাইস্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় যোগদান করিয়া তৎপরদিন প্রাতে কাটোয়া লোকাল ট্রেনে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে ফিরিলাম।

সমাপ্ত

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দের—

কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত

১। উপনিষৎ, (১ম ভাগ)—২২০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

(ক) কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'প্রবর্তক' ১৩৬০ সালে ভাদ্র সংখ্যায় উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বেলুড়ের সুপণ্ডিত স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ইতি পূর্বে গীতা ও চণ্ডী অনুবাদ করিয়া বাংলায় সুপরিচিত হইয়াছেন। তিনি আলোচ্য পুস্তক 'উপনিষৎ' সম্পাদন করিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক-সমাজের মহৎ উপকার করিলেন। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী—এই দশ খানি প্রধান উপনিষদের সারতত্ত্ব বর্তমান পুস্তকে প্রাঞ্জল সহজ বাংলায় লিখিত। প্রত্যেক উপনিষদের সারমর্ম প্রধানতঃ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এবং আনন্দগিরির টীকার আলোকে বিবৃত। ইহা অনুবাদ বা সংকলন বা ব্যাখ্যা পুস্তক নহে। ইহাতে উপনিষদের তত্ত্বাংশ আদৌ বর্জিত বা কোন অতিরিক্ত তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এই বইখানি পড়িলে দশ খানি উপনিষদের সারমর্ম সহজে অবগত হওয়া যায়। উপনিষৎ সম্বন্ধে এইরূপ পুস্তক বাংলায় সর্বপ্রথম বলা চলে।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় উপনিষদের অভিব্যক্তি আলোচিত। আলোচনা সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। ইহা উপনিষদ্ দর্শনের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক উপক্রমণিকারূপে পঠিত হইবার যোগ্য। পরিশিষ্টে বিদেশী ভাষায় উপনিষদাবলীর প্রচার সম্বন্ধে চৌদ্দ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিবরণে বহু নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট। স্বাধীনোত্তর মহাভারতে এরূপ গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পটটী মনোগ্রাহী ও তাৎপর্য্য-পূর্ণ।

(খ) কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ১৫ই কার্তিক, ১৩৬০ (১লা নভেম্বর, ১৯৫৩) রবিবার লিখিয়াছিলেন।—"ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশখানি উপনিষদের সারমর্ম প্রাঞ্জল বাংলাতে আলোচ্য গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উপনিষৎসমূহের কোন তত্ত্বাংশ আদৌ বর্জিত হয় নাই; কিংবা কোন অতিরিক্ত তত্ত্বও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। আচার্য্য শংকরের ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা এবং শংকরানন্দের দীপিকার আলোকেই উপনিষৎ দশখানির সারমর্ম গ্রন্থকার বিবৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক উপনিষদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে এবং পরে উপনিষদের সারমর্ম বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদের পরিচয় অংশে লেখকের বহু অধ্যয়নের সাক্ষ্য পাওয়া যায়; আর গ্রন্থের ভূমিকাটীও তথ্যবহুল ও মূল্যবান। সাধারণ পাঠক সমাজে উপনিষদের বাণী প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচারে স্বামিজীর এই প্রচেষ্টা বস্তুতঃই বিশেষ অবদানরূপে গৃহীত হইবে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

২। **The Devi-Mahatmya**—(১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা)

(ক) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৩ লিখিয়াছিলেন।—

There have been many Bengali editions of Sri Sri Chandi, including the one published by the Udbodhan office and tıanslated by Swami Jagadiswarananda. An English translation of this popular Sanskıit classic was long overdue. We are thankful to Sri Ramakrishna Math, Madras for having brought out this translation. Although well-known as Chandi in Bengal the book bears the title of Devi-mahatmya or Sri Durgasaptasati to which readers outside Bengal in general and those in South India in particular are more accustomed. Besides the main

textual portion the book contains such additional topics as Argalastotra, Kilaka stotra, Devi kavach, Aparadhksamapana stotra and Devi-sukta which apart from their indispensability as a religious text is an added merit of the book. A noteworthy feature of this publication is the arresting prominence of the Devanagari types in which the Sanskrit verses have been printed. The printing and get-up are upto the mark.

(খ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মান্দ্রাজের বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৩ লিখিয়াছেন।—

The Puranas and the Tantras are a store-house of stotras and mahatmyas ; and the Devi-mahatmya under notice occurs as chapters 81 to 93 of the Markandeya Purana. It is a well-known prayer-book of the worshippers of Devi and its popularity is attested by the fact that it has called forth a number of commentaries and translations. It is also called Durga-sapta-sati or a Book 700 mantras on Durga. It is recited with devotion on occasions sacred to Devi, especially during Navaratri. A certain king having been ousted from kingdom by enemies repaired to a forest and there met a merchant who had similarly been driven out from his home. But since the mind of the two exiles always kept on turning to their homes they consulted a sage. The sage told them that their attachment was due to the power of Mahamaya or the Supreme Illusion, and narrated the Devi-mahatmya (Greatness of Devi). Then as desired by the sage they took refuge with the Goddess and obtained liberation. This is the background of the prayer-book. The publication contains the text in Devanagari and translation in English followed by footnotes explaining the difficult

terms in the Text. Markandeya Purana as a whole has been translated by Pargiter and M. N. Dutta; but the present rendering of the Devi-mahatmya has been thoroughly revised and made liteial with a view to making the English-knowing reader easily understand the text. For the use of reciters of the Mahatmya are added Dhyana slokas, Argola stotra, Kilaka stotra and Devi-Kavach at the beginning and Devi sukta at the end. The students of Hindu realigion are indebted to Swami Jagadiswarananda for bringing out a valuable edition of the book. The printing and get-up maintain the high standard of the publications of the Ramakrishna Math at Madras.

(গ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক 'মডার্ণ রিভিউ' ১৯৫৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় লিখিয়াছেন।—

We welcome this addition to the sanskrit scriptures series ot the reputed publishers of Madras. It contains the sacred text of what is popularly called the chandi in Devanagari type followed by a faithful and lucid English translations with occasional footnotes by Swami Jagadiswarananda. Swamiji's Bengali edditions of the Gita and Chandi are extremely popular and his English translations of the Brihadaranyaka Upanishad has earned for him a place of great authority and honour. The present edition of the Chandi, we doubt not, will be warmly received by the English-knowing public; it removes a long-felt want of theirs, The translation is based on Pargiter and other authorities and has been revised by the eminent Dr. Raghavan of Madras University. As the text is chanted on sacred occasions all the necessary accessories are printed in original, making the edition equally attractive for the public at large.

(ঘ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মাদ্রাজের বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক 'হিন্দু' ১৯৫৩ খ্রীঃ ১১ই অক্টোবর রবিবার লিখিয়াছেন।—

The Devi-Mahatmya, also known as Durga-Sapta-Sati has so much been in vogue all through India as a sacred book for parayanam that the majority of the devotees ceased to care to know the meaning of the text. This circumstance has been responsible for the corruptions of the text that have crept here and there. But the Parayana Bidhi prescribes that the reader should follow the sense while reading. For the thoughtful inquirer translators like Dutta and Pargiter have rendered a good service. Swami Jagadiswarananda who rendered the text into Bengali has now undertaken its translation into English. He has consulted the earlier translations in English and Hindi. The English translation is a great help to readers for their following the text inteligently. Footnotes are also given where necessary. He has restored the text to its purity in many places where it was obscured by corruptions. Enough praise connot be bestowed on the elegance and accuracy of the translation.

৩। **বুদ্ধের কথা ও গল্প**—২৯০ পৃষ্ঠা. মূল্য ৩৲ টাকা।

(১) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক বৌদ্ধ পত্রিকা "জগজ্জ্যোতিঃ" ১৩৬০ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখিয়াছেন।—

"বর্তমান যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি বহু লোকের আদর বাড়িয়াছে এবং বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থের আদর্শে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত পুস্তক রচনা করিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থকার স্বামিজীও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।...এই গ্রন্থ সংকলনে স্বামিজী প্রৌঢ় বয়সে কষ্ট স্বীকার

করিয়াছেন। যাহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে তাহারা ইহাতে অনেক বিষয়ের সন্ধান পাইবেন। মলাটের সজ্জা বেশ আকর্ষণীয়।"

৪। **নবযুগের মহাপুরুষ** (২য় ভাগ)—৫১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲ টাকা।

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'প্রবর্তক'এর ১৩৬০ আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-বর্গের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চব্বিশটী শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছয়টী শিষ্যের জীবনী প্রকাশিত। দ্বিতীয় ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুই শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অধরলাল সেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাত শিষ্য স্বামী বোধানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, আত্মানন্দ, নির্মলানন্দ ও বিরজানন্দের জীবনী আছে। এতদ্ব্যতীত নবযুগের সুযোগ্য প্রতিনিধি আরো ছয়টী অমর পুরুষের জীবনী ইহাতে সংযোজিত—যথা শ্রীরমণ মহর্ষি, স্বামী রামতীর্থ, ঋষি অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। উভয় ভাগে মোট তেতাল্লিশটী মহাপুরুষের জীবনী সংগৃহীত।

এই সকল জীবনীতে শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী বিবৃত হয় নাই, নবযুগের ধর্ম ভাবের ও ধর্মান্দোলনের যুগান্তকারী ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ। আধুনিক ধর্মধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই জীবনী-সংগ্রহ অধ্যয়ন ও অনুধ্যান অত্যাবশ্যক। নবযুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় এতগুলি মহাপুরুষের জীবনী একত্র অন্য কোন পুস্তকে সম্ভবতঃ পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ জীবনীই বাংলায় প্রথম প্রকাশিত। কয়েকটী অধ্যায়ের কিয়দংশ পূর্বে মাসিক ও দৈনিক বসুমতি, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ঋষি অরবিন্দ' শীর্ষক অধ্যায় সম্পূর্ণ আকারে 'প্রবর্তক' মাসিকে বাহির হইয়াছিল। পরিশিষ্টত্রয়ে নবযুগের কয়েকজন মহাপুরুষের তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায়। প্রথম পরিশিষ্টে স্বামীজী, নেতাজী ও মহাত্মাজীর যে তুলনামূলক আলোচনা আছে তাহা সারগর্ভ ও প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রমণ মহর্ষি বর্তমান যুগে যে ধর্মাদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা দ্বিতীয় পরিশিষ্টে বিবৃত। তৃতীয় পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কথা আছে। উক্ত অংশ ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লিখিত এবং তৎপ্রণীত বিবেকানন্দ জীবনীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উহা মূল ফরাসী ভাষায় রচিত এবং উহার ইংরাজি অনুবাদ অদ্যাপি ভারতে প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী জগদীশ্বরানন্দই উহার প্রথম বঙ্গানুবাদ করিয়া 'প্রবর্তক' মাসিকে প্রকাশ করেন। সেই অনুবাদই আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত।

পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং লিখন-ভঙ্গীও সাবলীল। ইহার ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ মনোরম। পুস্তক খানি সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে ইহাকে একটী সমৃদ্ধ অবদান বলা যায়।

৫। **শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ**—১৮৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০ আনা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'জনসেবক' উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ১৩৫৯ সালে ২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই, ১৩৫২) রবিবার লিখিয়াছেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচরদের সম্বন্ধে বহু নূতন কথা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণের শিষ্যগণের জীবনের কয়েকটী ঘটনা ও কথোপকথন এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ 'উদ্বোধন' মাসিকপত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। "মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী এমন অলৌকিক যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং ছোট ছোট কথায় তাঁহাদের মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। এক কণা চিনি মুখে দিলেই বুঝা যায়, চিনি কত সুমিষ্ট ; বিন্দুমাত্র অমৃত পান করিলেই মধুর আস্বাদে মুখ ভরিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গঙ্গা স্পর্শ করিতে হইলে যে কোন স্থানে ইহা স্পর্শ করিলেই হয়, হরিদ্বার হইতে সাগর পর্য্যন্ত সারা গঙ্গা স্পর্শ করিতে হয় না।" এই দিক দিয়া বিচার করিলে আলোচ্য গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালী পাঠক সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

৬। **কিশোর গীতা**—১২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ২০শে আশ্বিন, ১৩৫৮ (৭ই অক্টোবর, ১৯৫১) রবিবার লিখিয়াছেন।—

আলোচ্য গ্রন্থটীর নামেই পুস্তকটীর পরিচয়। গীতার সংস্কৃতের গুরুত্বভার আবরণের অন্তরালে যে মধুর ভাবরস ও জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, লেখক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও কিশোরীদের জন্য তাহা সহজ সরল বাংলায় পরিবেশন করিয়াছেন। অবশ্য গ্রন্থটীতে গীতার কয়েকটী বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ শ্লোক তিনি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নিতান্ত বিজ্ঞতার সহিত মূল গীতার ভাব ও ভাষা হইতে লেখনীকে বিচ্যুত করেন নাই। গ্রন্থটীতে বিষয়-বস্তুর নির্বাচনেও গ্রন্থকারের দূর দৃষ্টি ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। উপনিষদাবলী, মহাভারতের অবশিষ্টাংশ এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রের সহিত গীতার কি সংযোগ তাহাও বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। এই সব কারণেই গ্রন্থকারের অভিনব প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করি।

৭। **কিশোর চণ্ডী**—৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'যুগান্তর' ১৩ই আশ্বিন ১৩৫৮ (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১) রবিবার লিখিয়াছেন।—

মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ, চণ্ডিকার পূজা ও আবির্ভাব ইত্যাদি উপাখ্যান লইয়াই শ্রীশ্রীচণ্ডী। দুর্গাপূজায় কিশোর-কিশোরীদের আনন্দের সীমা থাকে না। তবে চণ্ডীর গল্পগুলি তাহাদের অনেকের জানা নাই। সেই গুলি জানা থাকিলে দুর্গাপূজার মূল ভাবটী সহজে তাহারা বুঝিতে পারিবে। 'কিশোর চণ্ডী'তে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়া দেবীপূজার মূল উপাখ্যান সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ উপযোগী।

৮। **দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ**—১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় ১লা কার্তিক, ১৩৬০ (১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৩) রবিবার নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত।

"যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনের প্রধান অংশটা অতিবাহিত করেন দক্ষিণেশ্বরে। মা ভবতারিণীর পূজকরূপে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি তথায় সাধনায় ও সিদ্ধাবস্থায় প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করেন, এবং এই খানেই তাঁহার আলৌকিক মহিমা প্রকটিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়। গ্রন্থকার এই লীলাকাহিনী, 'দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ইতিবৃত্ত, মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথের জীবনেতিহাস এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিপুণ হস্তে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের যে সকল ভক্ত পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে আসেন পুস্তকখানি তাঁহাদের গাইডের কাজ করিবে। ইহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। ঝরঝরে ভাষার গুণে পুস্তকটী সুখপাঠ্য হইয়াছে।

৯। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—(৪৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲টাকা)

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাংলা মাসিক "প্রবাসী"র ১৩৪৬ সালে মাঘ সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

"এই গ্রন্থে গীতাপাঠবিধি, গীতার ধ্যান, গীতার বাঙ্ময়ী মূর্তি বিষয়-সূচী, এবং শ্লোক-সূচী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মূল শ্লোক বড় অক্ষরে, তন্নিম্নে ক্ষুদ্রাক্ষরে অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ এবং তন্নিম্নে মধ্যমাক্ষরে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিপৃষ্ঠায় ক্ষুদ্রাক্ষরে পাদটীকাও সংযোজিত। অন্বয় ও অনুবাদ শাঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী। পাদটীকামধ্যে টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতির ব্যাখ্যার সহিত তুলনাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। অপ্রসিদ্ধ দুরূহ শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, সমানার্থক শ্লোকের নির্দেশ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাদটীকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকে অতি সরল এবং মূলানুগত করিবার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। সাক্ষাৎ ভাবে / কেবল মূলের সাহায্যে গীতার অর্থ বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি অতীব উপযোগী। বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত।"

১০। সারদা দেবীর কথা ও গল্প—৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

(ক) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৬০ (৭ই মার্চ, ১৯৫৪) রবিবার লিখিয়াছেন।—

"পুণ্য জীবনের কথা শ্রবণ সকল সময়েই কল্যাণকর। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী নিজের জীবন সাধনায় যে পুণ্য মহিমা বিকিরণ করে গেছেন স্নিগ্ধ সৌরভের মতো তা আজও বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর অন্তরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি তাঁর জন্মশত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। স্বামীজী সাধক, পণ্ডিত ও শক্তিশালী লেখক। এই ছোট গ্রন্থখানিতে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সারদা জীবনের মহিমা ও মাধুর্য্য ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগিনী নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, এবং আরও অনেকে সারদা দেবী সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা বিবৃত হয়েছে। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন গল্পচ্ছলে ও নানা কাহিনীর সাহায্যে সারদা দেবীর পুণ্যজীবন ও চরিত্রের চিত্র। শেষ দুটী অধ্যায়ে সারদা দেবীর শত উপদেশ ও সারদা সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই কাছে বইখানার সমাদর হবে বলে আমরা আশা করি।

(খ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ৬ই চৈত্র, ১৩৬০ শনিবার নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—

"শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে অর্ঘ্যস্বরূপ এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। পুস্তক খানি ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মবান্ধব, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ কর্তৃক সারদা প্রশস্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে জননী সারদা দেবীর দিব্য লীলা কীর্তিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীসারদা-কথা-শতক শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলীর সংকলন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী তপানন্দ ও স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কর্তৃক বিরচিত দশটী সারদা-সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়েরই সন্ন্যাসী, সাধক এবং ভক্ত। মায়ের মহিমা এবং মাধুর্য্যের কথা এমন শ্রদ্ধা-সংযত সৌষ্ঠবে সংক্ষেপের মধ্যে গুছাইয়া বলিবার কৃতিত্ব তাঁহার ন্যায় সাধক পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীশ্রীমায়ের এই পুণ্য মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত সুন্দর প্রচ্ছদ-পট। ছাপা, কাগজও সুন্দর।

১১। **স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভে ব্রহ্মচর্য্য**—১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১০ই মাঘ ১৩৬০ (২৪শে জানুয়ারী ১৯৫৪) রবিবার নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রবীণ সন্ন্যাসী, পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ইংরাজীতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তক পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করায় তিনি বাংলাতে উক্ত বিষয়ে ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে পুস্তকের অভাব নাই; কিন্তু আলোচ্য পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টীভঙ্গী লইয়াই রচিত। গ্রন্থখানি বাঙ্গালী ছাত্রসমাজের প্রভূত উপকার সাধনে সক্ষম হইবে, যদি তাহারা আদর করিয়া উহা পাঠ করে। কাজেই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই কামনা করিবেন।